সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৫

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2015

With the Compliments of

Principal Staff Officer
Armed Forces Division

সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৫

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2015

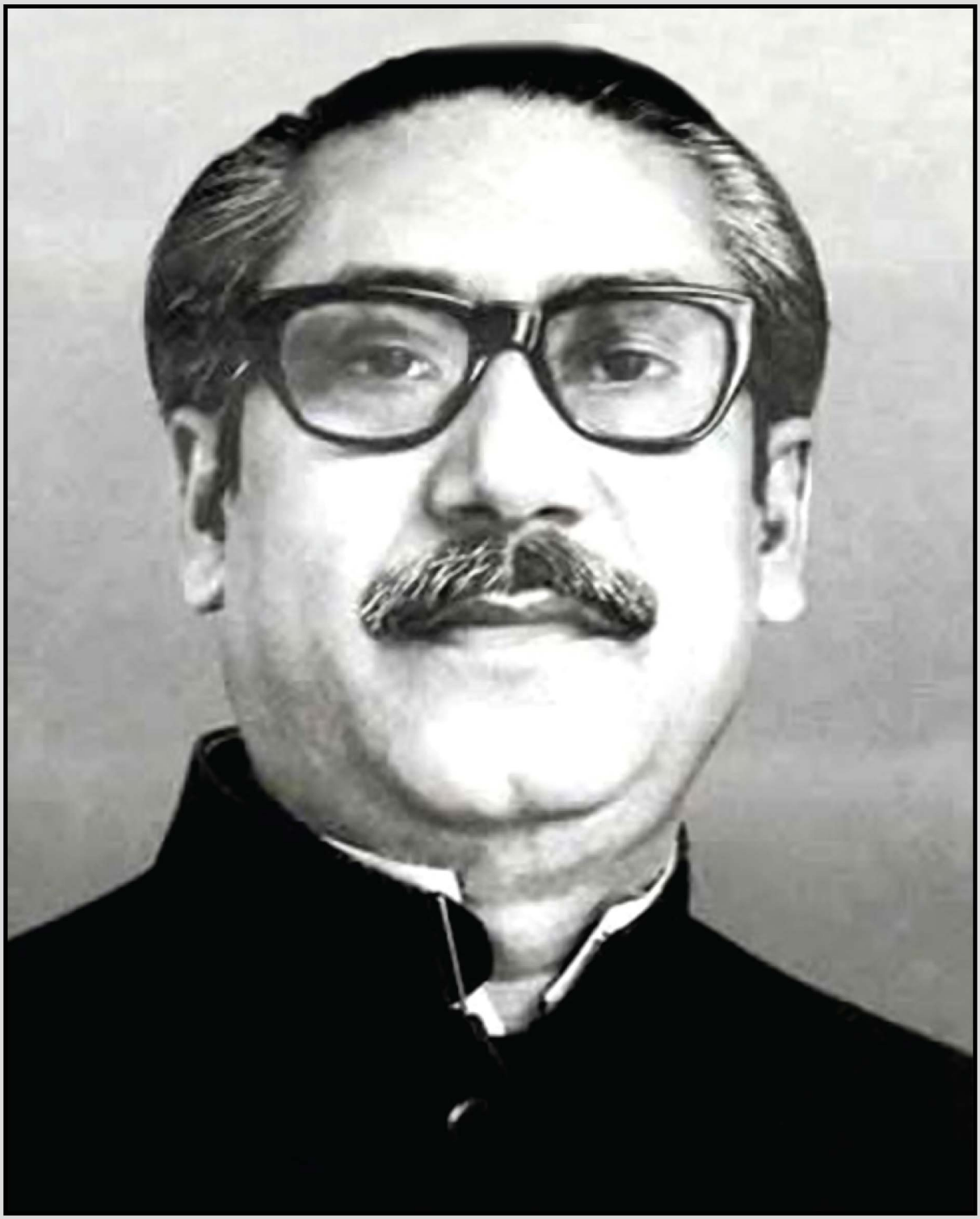

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

... বাংলাদেশের মালিক আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ, সেজন্যই সম্ভব হয়েছে আজ আমাদের নিজের মাটিতে একাডেমি করার। আমি আশা করি, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ এমন দিন আসবে, এই একাডেমির নাম শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, সমস্ত দুনিয়াতে সম্মান অর্জন করবে। ...

... আজ এই একাডেমিতে আমাদের অনেক কিছুই নাই, আমরা সামান্য কিছু নিয়ে শুরু করেছিলাম, অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। সবকিছু তোমাদের আমরা দিতে পারি নাই। তোমাদের কমান্ডাররা অনেক কষ্ট করে তোমাদের ট্রেনিং দিয়েছে। কিন্তু, আজ যা আমি দেখলাম তাতে আমি বিশ্বাস করতে পারি, যদি পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তবে আমার ছেলেদের সেই শক্তি আছে, যে কোন দেশের, যে কোন সৈনিকের সঙ্গে তারা মোকাবেলা করতে পারে। ...

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে প্রথম প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

শিল্পীর চোখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাস্তবায়ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২২
২১ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

একুশে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'। এ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি এ দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি জেল-জুলুম উপেক্ষা করে সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এ দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফকে, যাঁরা মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদাত বরণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতির অহংকার। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী একটি উঁচু পেশাদার, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সরকার ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছে। এর ফলে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে জনবল, স্থাপনা, আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এসব কর্মসূচি সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। যেকোন বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২২
২১ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র সকল শহীদের প্রতি যারা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁর দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর বিশেষ গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। ঐক্যবদ্ধ এই আক্রমণের মুখে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমরা পাই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ; নিজস্ব পতাকা এবং জাতীয় সংগীত। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি জাতির পিতা একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খান উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু'টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। যেগুলো প্রায় ৪০ বছর পর আজও চালু আছে। একইভাবে বিমান বাহিনীর জন্য বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গী বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও র‍্যাডার সংগ্রহ করেন। তাঁর হাতে গড়া সশস্ত্র বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে দেশ ও বিদেশের সকল কর্মকাণ্ডে।

জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার

(৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক)

শিখা অনির্বাণ, ঢাকা সেনানিবাস

(মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগের প্রতীক)

بسم الله الرحمن الرحيم

সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

★ ★ ★ ★

সেনাবাহিনী প্রধান

বাণী

একুশে নভেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের নিকট একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে দেশ মাতৃকাকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ দেশের মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমনের সূচনা করেছিল। এই সম্মিলিত প্রয়াসে ত্বরান্বিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা অর্জন। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহতী দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়েই আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীদদেরকে, যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। এই মহান দিনে আমি সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আদর্শকে পাথেয় করে আমাদের সকলকে এই ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত রাখতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাংবিধানিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গঠন এবং বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ইতোমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের সেনাবাহিনী দেশের জন্য প্রভূত সম্মান বয়ে এনেছে। সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অদম্য কর্মস্পৃহা, উন্নত পেশাগত দক্ষতা ও সামরিক শৃঙ্খলাবোধের জন্যই এই সম্মান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁদের এই অর্জনকে অম্লান রেখে দৃপ্ত পদভারে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি জার্নাল প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমার বিশ্বাস, আমাদের নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে এই প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী সদর দপ্তর
বনানী, ঢাকা-১২১৩

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় দিন। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের এ দিনে দেশমাতৃকাকে রক্ষার মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনায় সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় দামাল ছেলেরা শত্রুসেনার ওপর সম্মিলিত আক্রমণ সূচনা করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। তাই ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দেশমাতৃকাকে রক্ষার আজন্ম গৌরবগাঁথার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতা আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দেশমাতৃকাকে রক্ষার জন্য আপামর জনতা এবং সশস্ত্র বাহিনী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় আমাদের দেশ 'বাংলাদেশ'। জাতির এই প্রাপ্তি অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনী দিবস তাই আমাদের অনেক গর্বের। এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে সূচিত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদদের, যাঁদের আত্মোৎসর্গে এবং সুমহান ত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ কর্তব্য পালনের পাশাপাশি জাতির সেবায় নিয়োজিত। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী সাহসিকতার সাথে দায়িত্বপালনে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পেশাগত দক্ষতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে নিরলসভাবে জাতির জন্য কাজ করতে সদা প্রস্তুত। তাই ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের সংকটকালে ও জাতিগঠনমূলক কাজে এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। অপার দেশপ্রেম আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সশস্ত্র বাহিনীর অংশ হিসেবে নৌবাহিনী দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলেছে। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের দ্বারপ্রান্তে। সময়ের পরিক্রমায় নৌবাহিনী আজ অধিকতর সুগঠিত ও সম্প্রসারিত বাহিনী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে জার্নাল প্রকাশের জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

এম ফরিদ হাবিব
ভাইস এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

بسم الله الرحمن الرحيم

বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

বিমান বাহিনী প্রধান

বাণী

একুশে নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে সমগ্র জাতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সেনানীরা শুরু করে জল, স্থল ও আকাশপথে সম্মিলিত আক্রমণ। ফলশ্রুতিতে ত্বরান্বিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। সেদিনের সশস্ত্র বাহিনী তাদের মেধা-মনন, কর্মদক্ষতা ও পেশাগত নৈপুণ্যের জন্য আজ স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গর্বিত পদচারণার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমগ্র জাতি আজ তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সশস্ত্র বাহিনীর আত্মোৎসর্গকারী মহান বীরদের এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদকে; সেই সাথে পরম করুণাময়ের কাছে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি। আমি বিশ্বাস করি, পূর্বসূরিদের মহান আত্মত্যাগের চেতনা আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন। পরিশেষে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

আবু এসরার
এয়ার মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস

মুখবন্ধ

আজ ২১ নভেম্বর, সশস্ত্র বাহিনী দিবসের গৌরবোজ্জ্বল ক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকার জন্যই আজ আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। তাঁদের এই আত্মত্যাগ এবং অবদান বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

জাতির জনকের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাগণ একাত্ম হয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানের সূচনা করেন, যা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। তাই মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের কাছে এই মহতী দিবস, দেশ রক্ষায় আত্মোৎসর্গের জন্য দৃপ্ত শপথ গ্রহণের দিন।

সময়ের পরিক্রমায় স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনী একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে ক্রমব্যাপ্তি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতি গঠনে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন– দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আর্তমানবতার সেবা, জরুরি প্রয়োজনে দায়িত্ব পালন ইত্যাদিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন ও অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিত প্রশিক্ষণে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ব পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বলতর করে চলেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও একটি জার্নাল প্রকাশিত হলো। জার্নালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাহিনীত্রয়ের প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট সকলের মেধা, মনন ও শ্রমের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের লেখা ও ছবিসংবলিত এ স্মরণিকাটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি সৃজনশীল এ প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মোঃ মইনুল ইসলাম
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

আমাদের বীরশ্রেষ্ঠরা যেভাবে শহীদ হয়েছেন

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১৪ অক্টোবর ৭ নম্বর সেক্টরের মাহাদীপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্রুমুক্ত করার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন এবং শত্রুর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন।

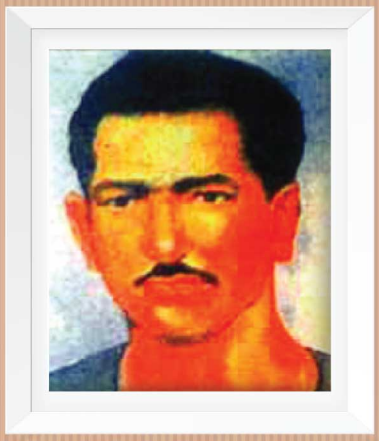

বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর ১ নম্বর সেক্টরের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চট্টগ্রাম জেলার ধলই এলাকায় শত্রুর মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস করে সহযোদ্ধাদের আক্রমণ ত্বরান্বিত করেন এবং শত্রুর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গঙ্গাসাগর এলাকায় শত্রুর আক্রমণ ও ভারী কামানের গোলাবর্ষণের মুখে লাইট মেশিনগানের গুলি ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজ অবস্থান থেকে একা শত্রুর মোকাবিলা করেন। পরে শত্রুর গুলিতে ও কেয়ানেটের আঘাতে শাহাদত বরণ করেন।

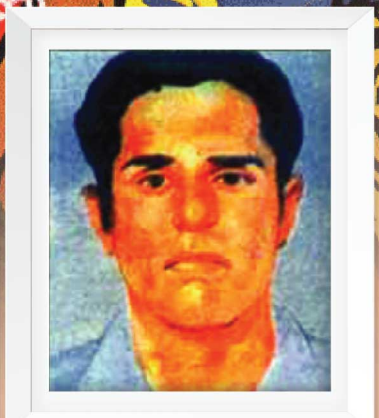

বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন (নৌবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর খুলনার রূপসা নদীতে যুদ্ধরত বাংলাদেশের রণতরী বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ পলাশে জঙ্গিবিমান থেকে গোলাবর্ষণে আগুন ধরে যায়। ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন রণতরী পলাশকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শহীদ হন।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বিমান বাহিনী)

১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট পাকিস্তানের মশরুর বিমানঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি পাইলট দুই আসনবিশিষ্ট একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান চালানোর সময় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান পাকিস্তানি পাইলটের কাছ থেকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা করেন এবং ভারতের সীমান্তের কাছে চলে আসেন। বিমানটি আকাশে অবস্থানকালীন পাকিস্তানি পাইলটের সাথে বিমান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শারীরিক সংঘর্ষকালে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান শাহাদত বরণ করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধরত অবস্থায় রাঙামাটি জেলার বুড়িঘাট এলাকার প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকাকালীন ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফের কোম্পানির ওপর শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু হয়। এ সময় কোম্পানির প্রতিরক্ষা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য মুন্সি আবদুর রউফ কভারিং ফায়ার প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং শত্রুর ওপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করে শত্রু বাহিনীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর একটি শেলের বিস্ফোরণে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরে যুদ্ধকালীন যশোর জেলার চৌগাছা থানার সুতিপুর প্রতিরক্ষা এলাকার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামের কাছে স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন। তিনি শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং সহাযোদ্ধা সিপাহী নান্টু মিয়া গুলিবিদ্ধ হলে নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁকে কাঁধে নিয়ে মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে যেতে থাকেন এবং এসএলআরের মাধ্যমে গুলি করে শত্রুর অগ্রসর বাধাগ্রস্ত করেন এবং সহযোদ্ধাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরতে সাহায্য করেন। এ সময় তিনি কাঁধে শত্রুর গুলি এবং হাঁটুতে শত্রুর শেলের আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন।

দেশমাতৃকার অমর সন্তান
আমরা তোমাদের ভুলব না

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদ

কমডোর এম নাজমুল হাসান, এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন
প্রধান সম্পাদক, এএফডি

কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি
সহকারী প্রধান সম্পাদক, এএফডি

জার্নাল সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা)

কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ, (সি), পিএসসি, বিএন
সম্পাদক, এএফডি

মেজর রোজিনা খন্দকার, এইসি
সহযোগী সম্পাদক, সেনাবাহিনী

ই. লে. কমান্ডার এম জসিম উদ্দিন, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী

স্কোয়াড্রন লীডার মো. আসাদুজ্জামান
সহযোগী সম্পাদক, বিমান বাহিনী

জার্নাল সম্পাদনা উপপর্ষদ (ইংরেজি)

লে. কর্নেল মো. তৌহিদুল ইসলাম, পিএসসি
সম্পাদক, এএফডি

মেজর সিনথিয়া সারমিন, এইসি
সহযোগী সম্পাদক, সেনাবাহিনী

ই. লে. কমান্ডার এ এইচ এম মশিয়ুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী

স্কোয়াড্রন লীডার শেখ মোহাম্মদ আলী
সহযোগী সম্পাদক, বিমান বাহিনী

ক্রোড়পত্র সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা ও ইংরেজি)

উইং কমান্ডার মো. রফিকুর রহমান, পিএসসি
সম্পাদক, এএফডি

মেজর এস এম শামীম ইবনে মঈন
সহযোগী সম্পাদক, এএফডি

লে. কমান্ডার লুৎফুন্নাহার, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, এএফডি

স্কোয়াড্রন লীডার মো. মিজানুর রহমান, পিএসসি
সহযোগী সম্পাদক, এএফডি

জার্নাল ও ক্রোড়পত্রের ছবি বাছাই কমিটি

লে. কর্নেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার, পিএসসি
সম্পাদক, এএফডি

ই. লেফটেন্যান্ট এস এম বাদিউজ্জামান, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী

উইং কমান্ডার এ কে এম রহমত উল্লাহ, পিএসসি
সহযোগী সম্পাদক, বিমান বাহিনী

EDITORIAL

The 21st November is the day to commemorate the significance and glories of our great War of Independence in 1971. The spirit of the day gives us a deep sense of pride and honour and is ever imprinted in the mind of every member of our Armed Forces. We gratefully acknowledge the supreme sacrifice made by our bravest sons of the soil and pay our homage to the martyrs of great Liberation War.

The Day marks immense significance in the history of our Liberation War. On this historic day, the valiant soldiers of Bangladesh Army, Navy and Air Force joined hands with the freedomfighters from all walks of life and launched an all-out attack on the occupation forces. The fierce attack coordinated from all sectors accelerated our victory and annihilated the occupation forces on 16 December 1971. Since then, 21st November is observed in the Armed Forces every year with a renewed pledge for safeguarding sovereignty of our beloved Nation. On this day, Nation along with the members of the Armed Forces solemnly pay homage to the martyrs and heroes of the Liberation War and express heartfelt gratitude to all the freedom fighters and their family members.

We feel a deep sense of satisfaction for being able to bring out a tributary journal among other commemorative events of 21st November organised by Armed Forces Division. The Armed Forces members contributed in publishing this Journal through their scholarly write-ups highlighting the spirit and ideals of Liberation War and other contemporary issues of military and strategic interests. We believe that, the readers' satisfaction would inspire the potential intellectuals of Armed Forces to contemplate and present their thoughts in future publications.

I am deeply indebted to the Principal Staff Officer, Armed Forces Division, whose vision, valuable guidance and overall patronage were indispensable for the publication of this Journal. He consistently encouraged us to review our ideas, refine our thought process and publish it as per plan. I would like to express my sincere appreciation to all members of the Editorial Committee for their insights and commitment. We are thankful to all three services of Bangladesh Armed Forces for extending their cooperation and accomplishment of the exhaustive task of printing the Journal. We hope and believe that the esteemed readers will sympathetically consider our shortcomings.

We pray to the Almighty for the salvation of the departed souls of the martyrs of our War of Independence. Let the spirit of Liberation War always be echoed in our hearts and minds in every step of our actions.

May Allah bless us all.

Chief Editor

বিভিন্ন সেনানিবাসে মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনাসমূহ

সমুন্নত স্বাধীনতা
ঢাকা সেনানিবাস

বিজয়কেতন
ঢাকা সেনানিবাস

মুক্তি সেনা
ঘাটাইল সেনানিবাস

স্মৃতি অম্লান
চট্টগ্রাম সেনানিবাস

যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ
কুমিল্লা সেনানিবাস

বিজয়গাঁথা
যশোর সেনানিবাস

সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

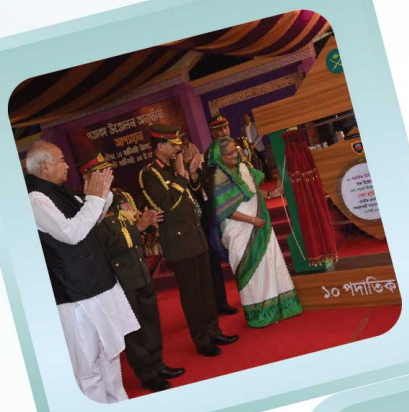

উন্নয়নের ধারায় সশস্ত্র বাহিনী

সাম্প্রতিককালে সশস্ত্র বাহিনীতে গুণগত ও অবকাঠামোগত প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১। মার্চ ২০১৫-এ কক্সবাজার জেলার রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন উদ্বোধন ও পতাকা উত্তোলন। একই সঙ্গে ডিভিশনের অধীন ১০ আর্টিলারি ব্রিগেড, ৯৭ পদাতিক ব্রিগেড, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৬০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৩৬ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের পতাকা উত্তোলন।

২। ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস উদ্বোধন।

৩।সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মেইন ব্যাটল ট্যাংক ২০০০ (MBT 2000), ওয়েপন লোকেটিং র‍্যাডার (WLR) এবং সেলফ প্রোপেলড গান-এর মতো অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র।

৪। সেনাবাহিনীতে প্রথমবারের মতো নারী সৈনিকদের অন্তর্ভুক্তি।

৫। চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিএমএইচসমূহে উন্নততর সেবা প্রদানের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নতুন ডিপার্টমেন্ট ও ওয়ার্ড সংযোজন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও ক্যানসার চিকিৎসার জন্য সিএমএইচ ঢাকায় Bone Marrow Transplantation Centre বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কেন্দ্র স্থাপন।

৬। সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে সেনাসদর কনফারেন্স ও অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স 'হেলমেট', আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এবং ঢাকা সেনানিবাসে ৫৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আধুনিক সৈনিক লাইন ও কার্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ।

৭। সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ঢাকা সেনানিবাসের মোস্তফা কামাল লাইন এলাকায় জেসিও এবং অন্যান্য পদবির সৈনিকের জন্য বেশ কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবন, একটি লেক, পায়ে চলা রাস্তাসহ আধুনিক রেস্টুরেন্ট ও একটি উন্মুক্ত এমফিথিয়েটার নিয়ে গড়ে ওঠা নয়নাভিরাম আবাসিক এলাকা 'নিসর্গ'।

৮। অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবির সৈনিকের জন্য ধামালকোট এলাকায় নির্মিত নয়নাভিরাম আধুনিক আবাসিক এলাকা 'নির্ঝর'।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১। নৌবাহিনীর অত্যাবশ্যকীয় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১৩ নৌবাহিনীর জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার রাবনাবাদে এভিয়েশন সুবিধাসংবলিত নৌঘাঁটি 'বানৌজা শের-ই-বাংলা'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২। নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রজয়সহ বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ, দুটি হেলিকপ্টার ও দুটি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্তকরণ।

৩। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশে আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত অয়েল ট্যাংকার বানৌজা কে জে আলী, খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক নির্মিত দুটি এলসিইউ বানৌজা সন্দ্বীপ ও বানৌজা হাতিয়া এবং ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মিত দুটি এলসিটি LCT-১০৩ ও LCT-১০৫ কমিশনিং/সংযোজন।

৪। বাংলাদেশ নৌবাহিনী United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক মানের হাইড্রোগ্রাফি চার্ট তৈরি, মুদ্রণ ও বিপণনে অংশীদারিত্ব অর্জন।

৫। ২০১৪ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার ক্রাউন পার্থে 'চতুর্থ ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌপ্রধান ও প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দুই বছরের জন্য 'ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম'-এর চেয়ারম্যানশিপ প্রদান।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১। বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি 'বঙ্গবন্ধু' স্থাপন।

২। বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক F-7BG1 যুদ্ধবিমান, Mi-171SH হেলিকপ্টার, K-8W জেট প্রশিক্ষণ বিমান, সর্বাধুনিক এভিওনিক্স ও আধুনিক প্রযুক্তির L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান এবং Fly-by-Wire নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক Advanced Jet Trainer YAK-130 অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩। দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্ভাব্য শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করার কাজে স্বল্পপাল্লার PL-9C মিসাইল এবং স্বল্পপাল্লার R-73 এবং দূরপাল্লার R-27 মিসাইল এবং অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র Surface to Air Missile (SAM) এফএম-৯০ সংযোজন।

৪। বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাইমা হক ও ফ্লাইং অফিসার তামান্না-ই-লুৎফির বিমান বাহিনীর ও বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী সামরিক বৈমানিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন।

৫। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর PT-6 প্রশিক্ষণ বিমানের ওভারহলিংয়ের জন্য ওভারহলিং প্ল্যান্ট (২১০ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট) স্থাপন।

৬। ২১৪ মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত সকল F-7 সিরিজ যুদ্ধবিমানের ওভারহলিংয়ের কার্যাদি সম্পাদন।

দেশ গঠনে
সশস্ত্র বাহিনী

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় গত এক বছরে সংগঠিত হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম, যা নিচে উদ্ধৃত হলো :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন জনগণের জন্য সারা দেশে ১০৬টি ব্যারাক হাউস নির্মাণ।

২। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন।

৩। রায়েরবাজার এলাকায় ৭৯.৬৫ একর ভূমিতে কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প সম্পাদন।

৪। থানচি-আলীকদম ৩৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন।

৫। কক্সবাজার-টেকনাফ ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন।

৬। রাঙামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাংগালহালিয়া-বান্দরবান (জেসিবিবি) ৫৮.৯২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।

৭। বাংগালহালিয়া-রাজস্থলী (বিআর) ২১.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।

৮। চিম্বুক-(ওয়াইজংশন)-রুমা ২৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ।

৯। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন।

১০। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়কে মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ।

১১। শিমুলিয়া-মাওয়া সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন।

১২। ঢাকা শহর রক্ষা বেড়িবাঁধ থেকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ৭৫% সড়ক নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদন।

১৩। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও মৌলভীবাজার জেলার কমলনগর উপজেলার মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ।

১৪। ঘাঘট নদীতে ৫,১৪৫ ফুট দৈর্ঘ্য, ৩২ ফুট প্রস্থ এবং ১২ ফুট উচ্চতার বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদন।

১৫। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে বালু ভরাট কার্যক্রম সম্পাদন।

১৬। মেঘনা সেতু ও গোমতী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ।

১৭। আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এআইবিএ), পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজ, তিনটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি মাধ্যম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৮। রংপুর সেনানিবাসে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়াস স্কুল নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদন।

১৯। যশোরে ৮৮ ফুট দীর্ঘ ও ২২ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১। নৌবাহিনী কর্তৃক ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ নামে প্রকল্প গ্রহণ।

২। মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে ৪৮,০৬,৫৬,৬৬৫/- টাকা মূল্যমানের সম্পদ আটক।

৩। জাটকাবিরোধী অপারেশন পরিচালনায় ৩৩,৪১,৮৩,২৫১ মিটার জাল, ৫৫টি বোট ও ৪২,৯১৮ কেজি জাটকা আটক।

৪। মিরপুর সেনানিবাসে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠাকরণ।

৫। চোরাচালানবিরোধী অভিযানে ৩৫৬ জন চোরাকারবারি ও ডাকাত আটক।

৬। দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকরণ, যেমন– মেঘনা নদীতে দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী ট্রলার ও নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধার, মংলা হারবারিয়ায় ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার, সেন্টমার্টিনের অদূরে ডুবন্ত ফিশিং ট্রলার ও নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধার, খুলনা সুন্দরবন এলাকায় শ্যালা নদীতে ডুবন্ত অয়েল ট্যাংকার উদ্ধার ও ফার্নেস অয়েল অপসারণ, মানিকগঞ্জে ডুবন্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ ও নিখোঁজ যাত্রী উদ্ধার এবং চট্টগ্রাম বহির্নোঙরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রেনিং এয়ারক্রাফট F-7 এবং নিখোঁজ পাইলটের উদ্ধার অভিযান।

৭। মানবপাচার প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনায় ৬টি বোট ও ৭৯৪ জন মানুষ উদ্ধার।

৮। চট্টগ্রাম নাবিক কলোনি-২-এ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য 'আশার আলো স্কুল' নামে পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ডে এমভি নৌ কল্যাণ-১ ও এমভি নৌ কল্যাণ-২ নামে দুটি কনটেইনার ভেসেল নির্মাণ।

১০। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সিরিজের চার্ট (INT Series Chart) সমূহ United Kingdom Hydrographic Organisation (UKHO) কর্তৃক মুদ্রণ ও বিশ্বব্যাপী বিপণন।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন অপারেশনাল, জরুরি পরিবহন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

২। সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ও জলসীমা পর্যবেক্ষণে বালাদেশ নৌবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৩। অতি সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ নেপালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প-পরবর্তী সরকারি ত্রাণ ও মেডিকেল টিম পরিবহন এবং নেপালে আটকে পড়া বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদ, শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিমান বাহিনীর সি-১৩০ পরিবহন বিমানযোগে ফিরিয়ে আনা।

৪। বাংলাদেশে বিমান বাহিনী পরিচালিত বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজসমূহে বিমান বাহিনীর সদস্যদের সন্তান ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের সন্তানদের অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান।

বাংলা প্রবন্ধসমূহের সূচিপত্র

১। বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের গুরুত্ব : বাংলাদেশের সাফল্য ও সম্ভাবনা ৯
কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি

২। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : বিশ্বসভায় নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ১৭
স্কোয়াড্রন লীডার মো. মোস্তফা কামাল, ফিন্যান্স

৩। সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের কার্যকরী সম্পর্কের গুরুত্ব ২৩
কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ, (সি), পিএসসি, বিএন

৪। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত আমাদের শান্তিরক্ষীরা ৩১
উইং কমান্ডার আ ন ম আব্দুল হান্নান, শিক্ষা

৫। পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিচুক্তি-পরবর্তী আর্থসামাজিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ৩৪
কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন খান, পিএসসি, জি

৬। রানা প্লাজা ভবন ধস : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নতুন মাত্রা ৪৬
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আমিরুল ইসলাম, পিএসসি, আর্টিলারি

৭। সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সমুদ্রজয় ৫৭
লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

Content of English Articles

1. **Promoting Joint Training Environment for Coastal Defence in Bangladesh** 70
Lieutenant Colonel Humayun Quyum, afwc, psc

2. **Pursuing Blue Economy and Maritime Security** 78
Commodore M Musa, (G), NPP, rcds, afwc, psc, BN

3. **Air Space Management of Bangladesh : Challenges and Prospects in Becoming a Middle Income Country** 91
Group Captain Md Mamunur Rashid, afwc, psc, ADWC

4. **Untold Success of Bangladesh Diesel Plant** 103
Brigadier General Asif Ahmed Ansari, afwc, psc

5. **Features Helping Bangladesh to become Top Ranking Troop Contributing Country in Global Peacekeeping and Corresponding Challenges** 112
Lieutenant Colonel Ali Reza Mohammad Ashaduzzaman, psc, Arty

6. **Maritime Cooperation in the Bay of Bengal RIM Countries** 119
Commander S M Maniruzzaman, (L), psc, BN

7. **Inspiring Young Generation with True Spirit of Glorious Tradition, Ethos and Values of Our Heroic Liberation War** 130
Major Dilip Kumar Roy, AEC & Major Sinthia Sarmin, AEC

8. **Chemical Warfare and Implementation of Chemical Weapons Convention in Bangladesh : Challenges and Way Forward** 136
Lieutenant Colonel Md Zakaria Hossain, psc, G, Arty

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের সাফল্য ও সম্ভাবনা

কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি

ভূমিকা/প্রেক্ষাপট

একটি পরিবার যেমন সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তেমনি একটি রাষ্ট্রের সুষম পরিচালনা নির্ভর করে এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সমঝোতা ও সহাবস্থানের ওপর। যেকোনো রাষ্ট্রের বেসামরিক ও সামরিক পরিমণ্ডলের গঠনগত মৌলিক পার্থক্য থাকে। সামরিক শক্তিকে যদি রক্ষণশীল বলা হয়, তবে বেসামরিক পরিমণ্ডলকে কিছুটা সংবেদনশীল ও পরিবর্তনশীল বলাই যায়। রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রগতির জন্য এই রক্ষণশীল ও সংবেদনশীল ধারা দুটির সহপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ। আর এই প্রবাহের স্বাভাবিকতার জন্য বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বা সম্পর্কের ভিত শক্তিশালী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজিতে 'Civil Military Relations', সংক্ষেপে CMR বাচ্যটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব পেয়ে আসছে, যার বাংলা অর্থ দাঁড়াবে 'বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ'। 'Relations' শব্দটির বাংলা অর্থে 'সম্পর্কের' পরিবর্তে 'সংযোগ' শব্দটি গতিময়তা আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন। বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সামরিক শক্তির ওপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি কোন ধরনের রূপরেখা রাষ্ট্র পরিচালনায় সবচেয়ে সহায়ক হবে, তা-ও উঠে এসেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সামরিক বাহিনীর অবস্থান বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ উন্নয়নে কতটা উপযোগী, তার বিশ্লেষণ ও প্রণিধান অপরিহার্য। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের বিষয়টি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে তাৎপর্য বহন করে। এই রচনাটিতে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের তত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই সংযোগ ও সম্পর্কের উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের সংজ্ঞা ও ইতিবৃত্ত

'বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ' বলতে একটি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সরকারের বেসামরিক সংগঠন এবং অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনের সম্পর্ক ও সংযোগকে বোঝায়। যেকোনো রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বেসামরিক ও সামরিক সংগঠনগুলোর সহযোগিতামূলক সংযোগ প্রয়োজন। ইংরেজিতে 'Civil Military Relations' সংক্ষেপে CMR (সিএমআর) বিশ্বব্যাপী একটি বহুল ব্যবহৃত বাচ্য।

'সিএমআর'-এর মূল ধারণার সূত্র খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত চীনা সমরবিশারদ সান জু-এর বিশ্লেষণে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'সামরিক বাহিনী গঠনগতভাবে রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ।' ১৮ শতাব্দীতে জার্মান সমর-বিশ্লেষক ক্লসউইজ-ও সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রের অধীন একটি শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এই চলমান ধারণার ভিত নড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এই সময় প্রথম

ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্রমে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণ সংঘটিত হয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সামরিক শক্তির প্রভাব সামরিক বাহিনীর ওপর গণতন্ত্রের পরীক্ষিত নিয়ন্ত্রণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই পটভূমিতে বিশ্বের প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও বিশ্লেষক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন এবং জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মরিস জানোউইজসহ বেশ কিছু শিক্ষাবিদ 'সিএমআর'কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন।

সিএমআর-এর উদ্দেশ্য

সিএমআর-এর উদ্দেশ্য মহৎ এবং সুদূরপ্রসারী। যেকোনো রাষ্ট্রের পরিচালনায় সুদৃঢ় বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্ক নিম্নলিখিতভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে :

- দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বেসামরিক সরকারি কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের পরিধি নিশ্চিতকরণ।
- জাতীয় প্রতিরক্ষায় সামরিক বাহিনীকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে নিয়োগ।
- বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতাভিত্তিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের তত্ত্বসমূহ

বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বা সম্পর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন কার্যকরী তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন :

ইনস্টিটিউশনাল থিওরি বা প্রতিষ্ঠানগত তত্ত্ব। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন 'বেসামরিক' ও 'সামরিক' বলতে দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছেন, যে প্রতিষ্ঠান দুটি স্বতন্ত্র নীতিমালা ও শিষ্টাচার অনুসরণ করে। তিনি সামরিক চিন্তাচেতনাকে রক্ষণশীল এবং বেসামরিক কার্যধারাকে সংবেদনশীল ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হান্টিংটন রাষ্ট্রের স্বার্থে বেসামরিক রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা জাতীয় সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসামরিক রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা সামরিক শক্তির ওপর 'Subjective Control' বা 'বিস্তারিত বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ'-এর পরিবর্তে 'Objective Control' বা 'লক্ষ্য নির্দেশক নিয়ন্ত্রণ' প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। লক্ষ্য নির্দেশক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিবে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে সে লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ নিবে।

'Convergence Theory' বা সম্মিলন তত্ত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরিস জানোউইজ বর্ণনা করেন যে, বেসামরিক ও সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার হওয়া সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজস্ব স্বতন্ত্র বজায় রেখে এ দুই শক্তিকে কোন বিন্দুতে সম্মিলিত হতে হবে। তিনি এই সম্মিলন অর্জনে বিভিন্ন যৌথ প্রশিক্ষণ ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বেসামরিক নেতৃত্বকে সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করার উপদেশ দিয়েছেন।

● **'Agency Theory'**। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পিটার ডি ফিবার মাইক্রো ইকোনমিকসের গঠনের আদলে বেসামরিক নেতৃত্বকে নীতিমালা নির্ধারণের দায়িত্ব এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে সেই প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন।

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের বিভিন্ন দিক

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বা 'সিএমআর' জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যুদ্ধে কিংবা শান্তিতে উভয় পরিস্থিতিতেই এই সম্পর্ক বা সংযোগ রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনায় অমিত তাৎপর্য বহন করে। সাধারণত যুদ্ধকালীন বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্তরঙ্গভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু শান্তিকালীন এই সংযোগ বা সম্পর্কের রূপরেখা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকে যায়। শান্তিকালীন আদর্শ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বেসামরিক ও সামরিক জগতের মৌলিক ভিন্নতা। যেকোনো প্রগতিশীল রাষ্ট্রেরই সামরিক শিষ্টাচার ও চিন্তাচেতনা মূলত রক্ষণশীল। অন্যদিকে রাষ্ট্রের বেসামরিক কার্যধারা সংবেদনশীল এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো পরিবর্তনশীল। যেকোনো রাষ্ট্রের প্রগতির জন্য রক্ষণশীল ও পরিবর্তনশীল এ দুটি ধারার দ্বন্দ্বহীন সহপ্রবাহ প্রয়োজন। গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে শান্তিকালীন এ প্রবাহ বহমান রাখার জন্য দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ :

নিয়ন্ত্রণ। স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের তত্ত্ব অনুযায়ী লক্ষ্য নির্দেশনার মাধ্যমে বেসামরিক নেতৃত্ব সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হান্টিংটনের মতে, বিস্তারিত বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ সামরিক শক্তির স্বকীয়তা নষ্ট করে। অন্যদিকে লক্ষ্য নির্দেশক নিয়ন্ত্রণ সামরিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকারিতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কার্যকারিতা। আদর্শ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের ক্ষেত্রে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সামরিক শক্তি কার্যকরভাবে তা প্রয়োগ করবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ অনুসরণ প্রয়োজন :

● জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা থাকতে হবে, যার সূত্রে রাষ্ট্রীয় রণকৌশল নির্ধারণ করা হবে।

● রাষ্ট্রীয় রণকৌশল বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী সামরিক কাঠামো থাকতে হবে।

● রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ জোগান করতে হবে এবং সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাফল্যের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আদর্শ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগকে চিহ্নিত

করা হয়। ভারতে স্বচ্ছ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ ভারতীয় গণতন্ত্রকে বেগবান রেখেছে। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সামরিক শক্তির ওপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ কতটা জরুরি, তার প্রমাণ মিলেছে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালার গত দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। ২০০৪ সালে গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট বার্জার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সামরিক শক্তির সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই ৫০ শতাংশ সামরিক শক্তি কমিয়ে আনেন। এতে পুরো দেশটির নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়, এমনকি অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পরে প্রেসিডেন্ট আলতারো কোলোব ২০০৮ সালে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ সাপেক্ষে সামরিক বাহিনীকে সংখ্যায় দ্বিগুণ করেন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মার্কিন সাফল্য অর্জিত না হওয়ার পেছনে যে কারণগুলোকে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে অন্যতম তৎকালীন মার্কিন বেসামরিক নেতৃত্বের সামরিক বাহিনীর ওপর বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপের সামরিক বাহিনী গতানুগতিক প্রথাগত সামরিক কৌশল ব্যবহার করেনি। তাই যুদ্ধে মার্কিন সামরিক জেনারেলরা পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুদ্ধনীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বেসামরিক মার্কিন নেতৃত্ব যুদ্ধনীতির বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়াতে সামরিক বাহিনীকে তা অনুসরণ করতে হয়। এই যুদ্ধের ফলাফল যে মার্কিনিদের পক্ষে যায়নি তা আজ বিশ্ব জানে। মার্কিনিরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উপসাগরীয় যুদ্ধ সামরিক বাহিনীর ওপর লক্ষ্য নির্ধারণমূলক নিয়ন্ত্রণ বা Objective Control প্রয়োগ করে, যা মার্কিন সামরিক বাহিনীকে স্বকীয়ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে সামরিক অপারেশন পরিচালনার সুযোগ দেয়। হান্টিংটনের নিয়ন্ত্রণের এই উপদেশ যুদ্ধ কিংবা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই বারবার বিশ্বব্যাপী উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিস্থিতি

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ আদর্শ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ১১টি সেক্টরে বিভক্ত হয় এবং এই সেক্টরগুলো বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে কার্যকর হয়ে ওঠে। সেক্টরগুলোর নেতৃত্ব দেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত বাঙালি জ্যেষ্ঠ অফিসাররা। তখন থেকে সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সামরিক বাহিনী নিম্নলিখিত কারণে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে :

- সামরিক বাহিনী সব সময় জাতীয় প্রয়োজনে, যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পার্বত্য চট্টগ্রামে কাউন্টার ইন্সারজেন্সি অপারেশন, জাতীয় নির্বাচন, জাতীয় ভোটার আইডি কার্ড তৈরি, গণতন্ত্র বাস্তবায়নে সহযোগিতা, সন্ত্রাস দমন, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ দেশ গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধু ব্রিজ, পাওয়ার স্টেশন, কি পয়েন্ট ইনস্টলেশনের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে আসছে।

- আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রেখেছে।

হান্টিংটনের জনপ্রিয় তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ

প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন যে 'Objective Control' বা লক্ষ্য নির্দেশক নিয়ন্ত্রণের মডেলকে কার্যকরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তার এক আদর্শ রূপরেখা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিদ্যমান। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় দুটো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে। প্রথমত, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ধারণ করে এবং সামরিক বাহিনীর অপারেশন, প্রশিক্ষণ, প্রশাসন, বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ ও গোয়েন্দা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যা সামরিক বাহিনীর বাজেট ও আইনি বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুটো মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে যথাক্রমে একজন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (লে. জেনারেল পদবির) এবং একজন সিনিয়র সচিবের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করেন। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এভাবেই সরকারের কাছ থেকে সামরিক বাহিনীর জন্য লক্ষ্য নির্ধারণমূলক নির্দেশনা গ্রহণ করে এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বেসামরিক সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনীর এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি আদর্শ এবং স্বতন্ত্র একটি মডেল যা সুপরীক্ষিত, কার্যকরী এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত।

বাংলাদেশের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের সাফল্য ও সম্ভাবনা

দৃঢ়কণ্ঠে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের একটি সফল রূপরেখা উপস্থাপনের দাবি করতে পারে। বাংলাদেশে সফল বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের আদর্শ উদাহরণ তৈরি হয়েছে বর্তমানের তিনটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটে। এগুলো হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং দেশ গঠনমূলক কার্যক্রম :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের সাফল্য। দেশ যখনই দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে, সামরিক শক্তি সার্বভৌমত্ব রক্ষার মূল দায়িত্বেও পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসামরিক জনগণের সহায়তায় নিবেদিত হয়েছে। ২০০৭ সালে বন্যা, সিডর, আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সেনানিবাস ছেড়ে বের হয়ে এসেছে বেসামরিক জনগণের সহায়তার উদ্দেশ্যে। বহিঃশত্রুর আকস্মিক আক্রমণে নিজেদের অল্প সময়ে সংঘটিত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে প্রশিক্ষণ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিয়ে থাকেন, সেই জ্ঞান, সেই কৌশল বাস্তবায়ন করে আকস্মিক দুর্যোগে নিজেদের সংঘটিত করে ন্যূনতম সময়ে পৌঁছে গেছে দুর্যোগ আক্রান্ত দুর্গত এলাকায়। যে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে শত্রুর আক্রমণের মুখে কঠিন পরিস্থিতিতে সেনা ছাউনিতে পানি সরবরাহ করার জন্য সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যরা প্রশিক্ষিত হন, আইলা ও সিডরে সেই শোধনযন্ত্র সৈনিকরা দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কবলিত সুপেয় পানিবিহীন এলাকায় স্থাপন করেছেন, বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাবার পানি সরবরাহ করেছেন, রক্ষা করেছেন পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি থেকে। বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার অল্প সময়ে পৌঁছে দিয়েছে জরুরি ত্রাণ, নৌবাহিনীর সদস্যরা নৌযান

রাষ্ট্রীয়ভাবে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের উন্নয়নের বিষয়টি বাংলাদেশে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তর নামে একটি পরিপূর্ণ এবং কার্যকরী পরিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কাজ করে আসছে। একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সমপদবির কর্মকর্তা (বর্তমানে নৌবাহিনীর কমডোর) এই পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এই পরিদপ্তরে প্রটোকল ও সেরিমনি, সিভিল লিয়াজোঁ এবং মিডিয়া সেকশন নামে তিনটি সেকশন আছে। বাংলাদেশে বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য এই পরিদপ্তরের সদস্যরা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে চলেছেন। এই পরিদপ্তরের নির্দেশনায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সামরিক বাহিনীর এই মহতী কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন বেসামরিক সংগঠন বছরব্যাপী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যৌথ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যা বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে নিয়মিত ভাবে অবহিত করছে। প্রতিবছর সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য সামরিক বাহিনীর সাথে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এই প্রশিক্ষণগুলো বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক উন্নয়নের অনেক সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার/অনুপ্রেরণা

যেকোনো রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বেসামরিক ও সামরিক সংগঠনগুলোর সহযোগিতামূলক সংযোগ প্রয়োজন। এ জন্যই ইংরেজি 'Civil Military Relations' বা 'CMR' বাচ্যটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব পেয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের প্রসিদ্ধ Institutional Theory-তে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামরিক শক্তির ওপর 'Objective Control' তথা লক্ষ্য নির্দেশক নিয়ন্ত্রণের যে মডেলকে কার্যকরী বলা হয়েছে তার আদর্শ প্রয়োগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় সামরিক বাহিনীর গঠনগত বিন্যাসে লক্ষ করা যায়।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সময়ের পরিক্রমায় তা অভিজ্ঞতালব্ধ ও উন্নততর হয়েছে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী পেশাদারিত্বের পাশাপাশি বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়া জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিসরেও বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে। বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের এই ক্রমোন্নয়ণ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার ধারাকে আরও বেগবান করা সম্ভব। সেই অমিত সম্ভাবনার বাস্তবায়নই আমাদের লক্ষ্য।

নিয়ে পৌঁছে গেছে নদীর ধারের দুর্গত মানুষের সহযোগিতায়। সামরিক চিকিৎসকরা মাসের পর মাস সেনানিবাস ছেড়ে তাঁবু গেড়ে থেকেছে সাধারণ জনগণের কাছাকাছি। তাদের দিয়েছে সুচিকিৎসা, সরবরাহ করেছে প্রয়োজনীয় ঔষধ। সামরিক ইঞ্জিনিয়াররা নদীভাঙন রোধে মিলিটারি ডোজার, লোডার নিয়ে বালু, পাথর ফেলে রক্ষা করেছে নদীভাঙন। বন্যা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং বন্যার্তদের সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছে সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সেল। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধসে চলেছে সামরিক বাহিনীর দিনে-রাতে অক্লান্ত উদ্ধার অভিযান। ২০১৩ সালে রানা প্লাজার উদ্ধার অভিযানে দেশের সামরিক-বেসামরিক জনগণ যখন একীভূত হয়ে একটি ধ্বংসস্তূপের ইট-সিমেন্ট সরিয়ে উদ্ধার করছে জীবিত ও মৃত মানুষকে, তখন আমরা বিশ্বাস করলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু নয়, মানবসৃষ্ট দুর্যোগেও বেসামরিক ও সামরিক সংযোগে বাংলাদেশ অনন্য।

বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় সামরিক বাহিনী। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকে। জাতীয় নির্বাচনে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য। 'ওয়াসা'কে পানি সরবরাহের জন্য সহযোগিতা প্রদান, সিটি করপোরেশনকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সামরিক বাহিনী কৃতিত্বের সাথে করে আসছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা কি পয়েন্ট ইনস্টলেশনগুলোতে নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানের কাজ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা চৌকসভাবে করে আসছে। ভোটার আইডি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নে সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বঙ্গবন্ধু ব্রিজের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ কিংবা ডিজিটাল পাসপোর্ট তৈরির ব্যবস্থাপনায় সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সামরিক ও বেসামরিক সংযোগকে দিয়েছে নতুন মাত্রা।

দেশ গঠনে সামরিক ও বেসামরিক সংযোগ। দেশ গঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সড়ক ও পরিবহন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক সংযোগের সাফল্য প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মিরপুর এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ, মিরপুর এয়ারপোর্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ, বনানী ওভারপাস নির্মাণ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা চার লেনে উন্নীতকরণ, মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ, মেঘনা গোমতী ব্রিজ মেরামত, পদ্মা ব্রিজ প্রকল্পে সহায়তাসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নে সহায়তা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিরলস পরিশ্রম এবং বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অধ্যায় মহান মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর। আমাদের সামরিক অবকাঠামোতে রয়েছে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের তত্ত্বের আদর্শ বাস্তবায়নের চিত্র। আর আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-পাত্রে রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের অনন্য দৃষ্টান্তসমূহ। এই সফল চিত্রটিই বাংলাদেশের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগের ক্রমবিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ভিত্তি তৈরি করেছে।

তথ্যসূত্র

১। ওয়েবসাইট : www.afd.gov.bd
২। ওয়েবসাইট : www.wikipedia.org
৩। স্যামুয়েল পি হানটিংটন, দ্য সোলজার এ্যান্ড দ্য স্টেট
৪। স্যামুয়েল পি হানটিংটন, দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস্

কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি, ২১ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ২৩ বিএমএ লং কোর্সের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সে কমিশন লাভ করেন। তিনি মিরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের একজন গ্র্যাজুয়েট। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স স্টাডিজের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্নেল মামুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্নেল মামুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষক, স্টাফ এবং ইউনিট কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মোজাম্বিক ও সুদানে জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ করেন।

কর্নেল মামুন দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অর্জন করেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের গ্রেড-১ স্টাফ অফিসার হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন বছর জাতিসংঘ মিশন সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে কর্নেল মামুন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরে কর্নেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : বিশ্বসভায় নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

স্কোয়াড্রন লীডার মো. মোস্তফা কামাল, ফিন্যান্স

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘ সনদের অধ্যায় ৬ ও ৭-এর ক্ষমতাবলে সংস্থাটি বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিনিয়ত অবদান রেখে চলেছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়োজিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা বর্তমান প্রেক্ষাপটে পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এই মহান ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে জাতিসংঘের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ১৯৮৮ সাল থেকে অত্যন্ত সুনাম, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। সুদীর্ঘ এ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে বিশ্বসভায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শান্তিরক্ষা মিশনের চ্যালেঞ্জ পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবময় অর্জন

এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থান লাভ করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এই গৌরবময় অর্জন একদিনে বা হঠাৎ করে আসেনি; বরং গত তিন দশক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অসামান্য ত্যাগের বিনিময়ে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৯৮৮ সালে প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ১,৩৬,০০০ সদস্য মোট ৩৪টি দেশে ৪৭টি শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বমোট প্রায় ৯,৬০০ সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে ১১৬টি সৈন্য প্রেরণকারী দেশের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পন্ন মোট ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশনের মধ্যে ২৩টি সম্পন্ন হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে। বর্তমানে সারা বিশ্বে জাতিসংঘ মোট ১৭টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করছে, তার মধ্যে ৯টি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। আর আফ্রিকা মহাদেশের এই ৯টি শান্তিরক্ষা মিশনের সবক'টিতেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

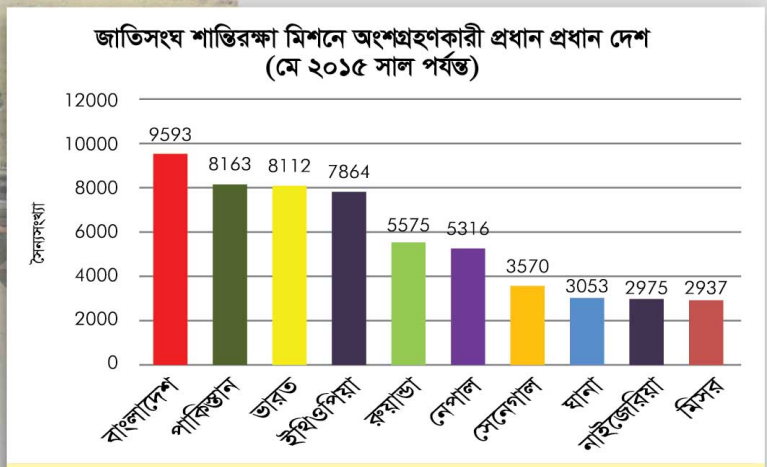

সূত্র : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বুকলেট

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সদস্যরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

স্থানীয় অধিবাসীদের মন জয় করে তিন দশক ধরে শান্তি পুনঃস্থাপনে জাতিসংঘের অধীনে কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের সকল দেশ ও বিবদমান দল/উপদলের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের এই গ্রহণযোগ্যতা এমনিতে আসেনি, বরং এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ। নিচে তাদের কয়েকটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো :

- বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী কর্তৃক সুশৃঙ্খলভাবে পেশাগত উৎকর্ষের সঙ্গে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করা।
- শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা।
- সব পরিস্থিতিতে ও সব পক্ষের কাছে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা।
- জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত ম্যান্ডেটের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা ও ন্যায়সংগতভাবে অভিযান পরিচালনা করা।
- স্থানীয় অধিবাসী ও সব পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ, বিশেষ করে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সম্মান করা।
- জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত সকল প্রকার আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
- স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নয়ন, বিশেষ করে বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, চাষাবাদে সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার, রিলিফ কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করা।

ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য চ্যালেঞ্জ

আফ্রিকা মহাদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ বিশাল ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। আর এ বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার রুক্ষ/দুর্গম ভূ-প্রকৃতি, ইবোলা ভাইরাস বর্তমানে শান্তিরক্ষীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। শান্তিরক্ষীরা তাদের সক্ষমতাসহ এসব এলাকায় নিয়োজিত হওয়া ও টিকে থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া বিবদমান দল/উপদলসমূহ কর্তৃক অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার শান্তিরক্ষীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন MINUSMA, যেখানে তীব্র তাপদাহ, ধূলিঝড়, খাবার পানির অপ্রতুলতা এবং বিবদমান দলগুলো কর্তৃক আত্মঘাতী হামলা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের এক অসম যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এ কারণে জাতিসংঘ মিশন-সংক্রান্ত আন্ডার সেক্রেটারি Harve` Ladsouse বলেন, 'The UN Cannot continue just using tools of 50 or 100 years ago.'

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিরক্ষার কাজে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হতে পারে, সেগুলো নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনীগুলো পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনও এর ব্যতিক্রম নয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ২০১৩ সালে Department of PeaceKeeping Operation (DPKO)-কে ডেমোক্রেটিক

রিপাবলিক অব কঙ্গো-এর পূর্বাঞ্চল কিভু প্রদেশে মানববিহীন আকাশযান (যা ড্রোন নামে বিশেষ পরিচিত) ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছে। এতে করে কিভু প্রদেশের দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে নজরদারি আরও সহজ হচ্ছে। MONUSCO মিশনে ড্রোন (Drone) ব্যবহারের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট হুমকি মোকাবিলা বা নজরদারি কাজে মিশন এলাকায় এয়ারবর্ন ফরোয়ার্ড লুকিং ইনফ্রারেড র‍্যাডার (FLIR), Ground Radar ইত্যাদি ব্যবহার শুরু হয়েছে। ড্রোন ছাড়াও জাতিসংঘ GPS ও GIS প্রযুক্তি ব্যবহার করে মালি মিশনে খাবার পানির উৎস সন্ধান করছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তি, যেমন– GIS, Long Range Counter Battery Radar, গোলন্দাজ বাহিনী কর্তৃক গোলাবর্ষণের অবস্থান শনাক্ত করতে Radar, Motion Sensitive Perimeter Lighting for UN Base, Handheld Biometric Devices, Weapon Locating System, Thermal Imaging Equipment ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শুধু শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করছে না, সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ড্রোন থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক সব ধরনের প্রযুক্তির সবই জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এসব প্রযুক্তি সংগ্রহ ও এ ধরনের প্রযুক্তিসহ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত হওয়া একটি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ।

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-এর পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমায় অবস্থিত MONUSCO-এর বিমানঘাঁটিতে একটি UN UAV-এর ব্যাটারি রিচার্জ করা হচ্ছে
সূত্র : www.france24.com

আফ্রিকার সমস্যা মোকাবিলায় আফ্রিকার সমাধান। সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আফ্রিকান নেতারা একটি স্লোগান বেশ জোরেশোরে তুলে ধরেন। আর তা হলো 'African Solution for African Problems', অর্থাৎ আফ্রিকার সমস্যার জন্য আফ্রিকার মতো সমাধান। এরই মধ্যে African Union তাদের সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে একটি শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি ব্রিগেড মহাদেশের পাঁচটি অঞ্চলে অবস্থান করছে। এদের মূল কাজ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে কাজ করা। উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সম্প্রতি African Union দারফুর, সোমালিয়াসহ বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর পরিবর্তে নিজেদের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করেছে। এর মাধ্যমে তারা তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব আরও সুদৃঢ় করতে চায়। এ ধরনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য আফ্রিকায় শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যেতে পারে।

জাতিসংঘ ম্যান্ডেট পরিবর্তন। শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানে আফ্রিকাসহ বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি আসতে শুরু করেছে। এ শান্তিপূর্ণ অবস্থার স্থায়িত্ব আনতে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন কৌশল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতিসংঘ মিশন অঞ্চলসমূহকে তার ম্যান্ডেট পরিবর্তন করে যুদ্ধ-পরবর্তী অবকাঠামোর উন্নয়ন,

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে শিল্পায়ন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অবদান রেখে চলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা বাহিনীর মূল ভূমিকার চেয়ে বেসামরিক কর্মকাণ্ড বেশি হওয়ায় বেসামরিক সদস্যদের অংশগ্রহণ বেশি লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, জাতিসংঘে বাংলাদেশের সামরিক অংশগ্রহণ যেমন শীর্ষস্থানীয়, অন্যদিকে এর বিপরীতে বেসামরিক অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

পরিচালনাগত সমস্যা। বাংলাদেশ একই সঙ্গে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মিশন পরিচালনা করে আসছে। এ মিশনসমূহ সাধারণত সেলফ সাসটেইন্ড, অর্থাৎ খাবার, বাসস্থান ও জ্বালানি ছাড়া যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট কর্তৃক নিজ ব্যবস্থায় মিশন এলাকায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টগুলো এ শর্তেই বিভিন্ন মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান, এপিসি, বিশেষায়িত ও সাধারণ যানবাহন, বিভিন্ন বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি, যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা এতদিন বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছে। ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে শান্তিরক্ষা মিশন বৃদ্ধির ফলে এর পরিচালনাগত সেবা প্রদান একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শান্তিরক্ষী সদস্য। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবলের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশিক্ষিত জনবল ছাড়া যেমন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না, তেমনি রাতারাতি এই প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে ওঠে না। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বর্তমানে যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, সে প্রযুক্তিসমূহের পাশাপাশি তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা বা এর কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

ভাষাগত দক্ষতা। আফ্রিকান বেশির ভাগ জাতিই হয় ফ্রাঙ্কোফোন অথবা আফ্রোফোন। অন্যদিকে জাতিসংঘে ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি অন্যতম সরকারি ভাষা। এখন পর্যন্ত আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষের মন জয় করে সাফল্যের সঙ্গে মিশন সম্পন্ন করে এলেও ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ভাষাগত দক্ষতার অভাব একটি প্রতিবন্ধকতা হতে পারে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সদর দপ্তর মিশন এলাকাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদেই ফরাসি ভাষায় দক্ষতা না থাকার কারণে আমাদের প্রার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে হোয়াইট হাউসে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশসহ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী শীর্ষ দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে বক্তৃতা দেন তার অংশবিশেষ হলো :

'...Over the last ten years, the demand on peacekeeping have grown, and operations have become more complex. It is in all our interest to improve the efficiency and effectiveness of these effort.'

তিন দশক ধরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা শত প্রতিকূলতা ও বাধা উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় নেতৃত্বের যে আসনে আসীন করেছে, তা চিরস্থায়ী নয়। বর্তমান পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন ও সংঘাতময় এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনের এ অর্জনকে ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারে। সম্ভাব্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে আমাদের অর্জনকে ধরে রাখতে ও ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহারের বিকল্প নেই। এ ধরনের সম্পদ সংগ্রহে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। বিশেষ করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যবহার শর্তসাপেক্ষে হলেও উন্নত বিশ্ব থেকে UAVসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু অন্য দেশের ওপর নির্ভর না করে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রতিনিয়ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আকাশযান ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা যেতে পারে।

উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষ শান্তিরক্ষী সদস্য। সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের পূর্বশর্ত উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল। এ ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন।

ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ইংরেজি ভাষা জানার পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ ও আরবি ভাষায় দক্ষতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের এসব ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন কোর্স চালু করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এ ধরনের ভাষাশিক্ষা কোর্স দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস/বিমানঘাঁটি/নৌঘাঁটিতে চালু করা যেতে পারে। এতে করে জাতিসংঘ কন্টিনজেন্ট মিশনে আমাদের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও মিশন এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিযোগিতা করা সহজতর হবে।

যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন। শান্তিরক্ষার কাজে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে আমাদের সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে শান্তিরক্ষা মিশনের পাশাপাশি জাতিসংঘের অধীনে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন কর্মসূচিসহ জাতিসংঘে আমাদের বেসামরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার

কঠোর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, অভিজ্ঞতা আর পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষস্থানটি ধরে রাখলেও এটি চিরস্থায়ী নয়। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নয়ন আর জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ আগের তুলনায় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ চায় আরও বেশি সক্ষম ও বহুমুখী কার্যক্ষম শান্তিরক্ষা বাহিনী। আর এ জন্যই সম্প্রতি জাতিসংঘ বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে মানববিহীন আকাশযান নিয়োজিত করেছে। জাতিসংঘের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের বিবৃতি

ও আলোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গৌরবের সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়নে একটি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানসহ বাহিনীর সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি। নিজ নিজ বাহিনীতে প্রতিনিয়ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে বলা যায়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর যে দামাল ছেলেরা অজানা-অচেনা পরিবেশে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেশকে বিশ্বসভায় নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছে, তারাই সব প্রতিকূলতাকে জয় করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র

১। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বুকলেট।

২। 'Are UN drones the future of peace keepers?' By : Sophie Pilgrim, http://www.-france24.com.Date: 09 Mar 2015

৩। Equipping a UN Peacekeeping Force for the Future. By Jessica Sun, http://www.stimson.org Dated: 10 Jul 2014.

৪। 'Providing the Right Troops and Equipment For United Nations Peace Keeping Missions' byJonathan Crook-2011. Institute for Democracy & Conflict Resolution - Briefing Paper (IDCR- BP-11/11).

৫। 'Bangladesh's Contribution to United Nations Peacekeeping Missions In Africa', By : Brigadier General Ilyas Iftekhar Rasul, ndc, psc (Retd), (A paper for the National Seminar on 'Look Africa : An Emerging Foreign Policy Option for Bangladesh' on 02 December 2010 at BIISS Auditorium)

৬। https://www.whitehouse.gov/the-press-office/un- peacekeeping-meet-21st-century-challenges-president-obamas- meeting-with-leaders.

স্কোয়াড্রন লীডার মো. মোস্তফা কামাল, ২০০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৪৯তম গ্রাউন্ড ব্রাঞ্চ কোর্সে, ফিন্যান্স শাখায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ ও ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে পেশাগত বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি পেশাগত জীবনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি/ ইউনিট ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিমান বাহিনী রেকর্ড অফিসে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পেনশন হিসেবে কর্মরত আছেন।

সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের কার্যকরী সম্পর্কের গুরুত্ব

কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ, (সি), পিএসসি, বিএন

'গণমাধ্যম হচ্ছে শাসনযন্ত্রসমূহের অতন্দ্র প্রহরী, তা সে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন। জনগণকে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ কী করছে না করছে, সে সম্পর্কে অবহিত করাই গণমাধ্যমের কাজ।'- বি. ই. ট্রেইনর

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখার জন্য যখন কোনো নিবেদিত প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা হয়, তখন সবার আগে সামরিক বাহিনীর কথা বলতে হয়। তবে এটা সত্যি যে, পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান একই ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে, আর সেটি হচ্ছে গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যম শুধু দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের ধারণ, বিশ্লেষণ কিংবা সম্প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তর নামে একটি পরিদপ্তর আছে। এই পরিদপ্তরের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল এবং বহুমাত্রিক। কেননা এই পরিদপ্তর বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, বেসামরিক জনগণ, গণমাধ্যম ইত্যাদি সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে। পাশাপাশি এটি সশস্ত্র বাহিনী তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রটোকল এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়সমূহের সমন্বয় করে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এই পরিদপ্তরের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও চিত্র আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের মাধ্যমে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের জন্যও এই পরিদপ্তর সমন্বয় করে। বস্তুত বেসামরিক প্রশাসন এবং তিন বাহিনীর সদর দপ্তরসমূহের সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বিষয়ের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য এই পরিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে।

সামরিক ও গণমাধ্যমবিষয়ক বিশ্লেষণের গভীরে গেলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম এবং সামরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব দেশে যুদ্ধ ও শান্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার নীতিনির্ধারণে সামরিক বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, সেখানে সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠানই দেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই তাদের সমন্বয় ও সহাবস্থান খুবই যুক্তিযুক্ত।

গত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল ও দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছে। কেবল দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেই এ বাহিনী পারঙ্গম নয়, বরং দেশ গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনয়ন, চোরাচালান প্রতিরোধ, সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশের জলে ও স্থলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় উদ্ধার-অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

বিধান এবং আরও নানাবিধ অভিযানে এই বাহিনী সরকারকে বিভিন্নভাবে কার্যকরী সহযোগিতা প্রদান করছে। জাতিসংঘের বিবেচনায় যোগ্যতম বাহিনী হিসেবে শান্তিরক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা মিশনে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দুর্যোগপীড়িত এলাকায় লাখ লাখ মানুষের ভালোবাসা ও শুভকামনা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে সম্মানের সঙ্গে অবিরাম কাজ করে চলেছে।

অন্যদিকে, গণমাধ্যম বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব তথা বাংলাদেশের উৎকর্ষতাকে উজ্জ্বল করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের গণমাধ্যমের অসাধারণ অবদানের ফলে চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাহিনীর বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাংলাদেশের পক্ষে নৈতিক সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গণমাধ্যম তাদের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গুরুত্বের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং বীরত্বগাথাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অব দ্য সি (ITLOS)-এর এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। এর আগে ১ নভেম্বর ২০০৮ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ একটি জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়। বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ এলাকায় মিয়ানমার তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সূত্রপাত হয়। আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী 'Gunboat Diplomacy'-এর মাধ্যমে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে। বস্তুত বাংলাদেশ সরকারের কার্যকরী কূটনৈতিক তৎপরতায় সংকট মোচনে সাফল্য আসে। এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের কর্মতৎপরতা যথোপযুক্তভাবে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দৃঢ়তার দাবিকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে এবং রাষ্ট্র ও সংবিধান সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। একই সঙ্গে উদ্দেশ্য পূরণে সামরিক বাহিনী নিজেদের সাফল্যগাথা, সাহস এবং গৌরবময় কর্মকাণ্ডকে গণমাধ্যমে তুলে ধরতে স্বপ্রণোদিত হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যম সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জন্য পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে, যার ফলে জনগণের বিভিন্ন অনুভূতি ও জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব-প্রবণতা গণমাধ্যমের সহজপ্রাপ্যতা এবং সহজগম্যতার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। গণমাধ্যম ক্রমবর্ধমান হারে নীতিনির্ধারকদের পরিধির উর্ধ্বে গিয়ে বিভিন্ন পরিমণ্ডল, যেমন– সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহায়তা করে। কোনো ঘটনাপরম্পরায় সংবাদ ও ছবি বিশ্বজুড়ে জনগণকে বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে ও প্রতিক্রিয়া জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলস্বরূপ, জনগণের বিভিন্ন পরিমণ্ডলের আলোচনা ও সমালোচনা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষিত এবং তথ্যসমৃদ্ধ জনগণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গণমাধ্যম জনগণকে তথ্যসমৃদ্ধ ও শিক্ষিত করে তুলতে অবদান রাখে।

সামরিক বাহিনীর জন্যও একই প্রেক্ষাপট প্রযোজ্য হতে পারে। গণমাধ্যম বা গণমাধ্যম উপদেষ্টা সামরিক বাহিনীর পক্ষে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অনেক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতের ভয়াবহ বিপর্যয় ঠেকাতে এবং পদ্ধতিগত বিভ্রাট সংশোধনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, যেমনটি ইরাকের আবু গারিব কারাগারের সমস্যাকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে গণমাধ্যম একটি বিপর্যয় রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। গণমাধ্যমের এই গুরুত্ব অনুধাবন করে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সকল কমান্ডারকে সহায়তা করার জন্য গণমাধ্যম উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্যমান প্রথা আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং সংবাদমাধ্যমের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিতকল্পে ১৯৭২ সালে 'আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা সামরিক বাহিনীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। তথ্য, প্রচারণা, জনসংযোগ এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই পরিদপ্তর কাজ করে। বর্তমানে এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। গণমাধ্যমকে সামরিক বাহিনীর সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংস্থাটিকে আরও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের টেকসই বন্ধন নিশ্চিতকল্পে একে অপরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কাজের ধরনকে স্বীকৃতি প্রদান করা দরকার। সামরিক বাহিনী একটি নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল বাহিনী। এ বাহিনী একটি সমজাতীয় বিধিবদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে বাস করে। ফলে এর বাইরের মানুষের কাছে এই আচার-সংস্কৃতি অন্য রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান এবং এ কারণেই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা একটি দেশের জন্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যম তার স্বআরোপিত নীতি ও বিধির ভেতরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যম বহুমুখী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও উদ্দেশ্যের নিরিখে স্ব-স্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা অর্জনের জন্য কাজ করে।

গণমাধ্যমকে তার কর্মক্ষেত্রে দেশপ্রেম প্রদর্শনের পাশাপাশি ব্যবসায়িক দিকটাও দেখতে হয়। সামরিক বাহিনীকে গণমাধ্যমের এ বিষয়টি বুঝতে হবে। ভিন্ন সংস্কৃতির কারণে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে গণমাধ্যমগুলোকে টিকে থাকতে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ করতে হয়। সাংবাদিকদের যেহেতু সামরিক সম্পর্কিত জ্ঞান অপর্যাপ্ত এবং সংবাদ তৈরি করতে সামরিক বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা স্বল্প সময়ের মধ্যে মেটানো সম্ভব নয়, তাই প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য তাদের সামরিক বাহিনীর ওপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সামরিক বিষয়ে সময়মতো তথ্য প্রদান প্রায়ই যুক্তিসংগত কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন পরিস্থিতিতে জনসম্পৃক্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করতে সামরিক বাহিনীর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে কথা বলার অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে গণমাধ্যমের প্রয়োজন কিছুটা হলেও ত্বরিত গতিতে মেটানো সম্ভব হয়।

অনুধাবনযোগ্য যে, সামরিক বাহিনী গণমাধ্যমকে সময়মতো সহায়তা না করলেও তাদের সময়মতোই কাজ শেষ করতে হয়। পর্যাপ্ত ধারণা ও তথ্যের অভাবে সাংবাদিকরা তাড়াহুড়া করে সংবাদ লিখতে ও সম্পাদনা করতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত সত্য তুলে ধরা কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত সংবাদ প্রচারের খাতিরেই সামরিক বাহিনীর উচিত গণমাধ্যমকে সহযোগিতা প্রদান করা। তাই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকল্পে সংবাদমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।

শান্তিকালীন ছাড়াও আমাদের যুদ্ধকালীন বা সংকটময় মুহূর্তের কথা ভাবা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে গণমাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করেন। গণমাধ্যমের প্রতি সামরিক বাহিনীর প্রকৃত ইতিবাচক অনুভূতি থাকাও মঙ্গলজনক। এর মধ্য দিয়ে শুধু জনসচেতনতা এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি সমর্থনই বাড়বে না, বরং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সৈনিকদের পরিবার অবহিত থাকার ফলে পরিবারের মনোবলও বৃদ্ধি পাবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আশপাশে কখন কী ঘটছে, তা জানতে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যম এবং সামরিক বাহিনীর ওপর চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করার দক্ষতা আরও বেশি গতিশীল হয়ে উঠছে। গণমাধ্যমের প্রয়োজন অনতিবিলম্বে সংঘটিত ঘটনার সংবাদ পাওয়া, যাতে তা সবার আগে প্রকাশ করা যায়। যখন গণমাধ্যম সামরিক বাহিনীর চলমান কোনো ঘটনার ওপর প্রতিবেদন বা সংবাদ তৈরি করে, তখন সামরিক বাহিনীর উচিত হবে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। গণমাধ্যমের প্রাথমিক সংবাদ পরিবেশন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী তা অবিলম্বে প্রেস ব্রিফিং করে প্রকৃত সত্য অবহিত করতে পারে। এতে করে রাষ্ট্রের পক্ষেও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। তবে এর জন্য সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যম পরস্পরের মধ্যে ভালো আন্তঃযোগাযোগ, দৃঢ় সম্পর্ক এবং আস্থা থাকা দরকার।

বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক ঐতিহ্যগতভাবে মসৃণ নয়। প্রধানত দুটি ধারণাকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হয়েছে; একটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান, যেমন : সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যে সংস্কৃতি, আচার, মূল্যবোধ বিষয়ক পার্থক্য; অপরটি হচ্ছে সংযোগের ব্যবধান, যেমন : পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও বোঝাপড়ার অভাব। সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যে আস্থার অভাব এবং অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে সাংবাদিকদের এমন সংবাদ প্রচার, যার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত সম্যক ধারণার অপর্যাপ্ততাই মূল কারণ। আসলে উভয় পক্ষেরই বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেখানে গণমাধ্যমের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে সকল বিষয়ে অবহিত করা, পক্ষান্তরে সামরিক বাহিনীর প্রচেষ্টা থাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে নিয়ম মাফিক সংরক্ষিত রাখা।

সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য দিনের ২৪ ঘণ্টাই গণমাধ্যমকে ব্যস্ত থাকতে হয়। গণমাধ্যমে ত্বরিত এবং দ্রুততার সঙ্গে সংবাদ তৈরি ও পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা তাদের সব সময় চাপের মধ্যে রাখে। ফলে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রকৃত সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ববাসীকে উপহার দেওয়া সম্ভব। ফলে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকৃত ঘটনাকে বদলে দিয়ে খেয়াল-খুশিমতো বিশ্বের দর্শক ও পাঠকদের মনোভাব পরিবর্তনে

সক্ষম গণমাধ্যম। তাই প্রযুক্তির উৎকর্ষ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুযোগ থেকেই যায় এবং তা করা বিবেচনাপ্রসূত।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গণমাধ্যম নীতিমালাই হতে পারে সেরা সহায়ক। গণযোগাযোগকে উপস্থাপন করতে গণমাধ্যম নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। যার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ও জনগণ উভয়ের কাছে গণমাধ্যমকে গুরুত্ববাহী করে তুলবে। এই নীতিমালার ফলে জনগণ সম্পৃক্ত কর্মী এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অপারেশনাল কমান্ডাররা উভয়ে একটি কাঠামো পাবেন, যার মাধ্যমে তাঁরা গণমাধ্যমের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন। সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে সামরিক পরিবেশে কাজ করার সময় গণমাধ্যম তাদের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস পাবে।

সামরিক বাহিনীকে অব্যাহতভাবে গণমাধ্যমের কাছাকাছি যাওয়া জারি রাখতে হবে। দেশে-বিদেশে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং সংকটকালে সামরিক বাহিনীকে গণমাধ্যমের সঙ্গে ভালোভাবে সম্পৃক্ত থাকতে ও সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে সামরিক বাহিনী গণমাধ্যমকে বিভিন্ন সামরিক কর্মকাণ্ড অবলোকনে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং ২০১৫ সালে সংঘটিত নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পকবলিত এলাকা পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নেপালে প্রেরণসহ নানাভাবে সহযোগিতা করা হয়েছিল।

এ ছাড়া সামরিক বাহিনী তাদের বিভিন্ন বার্ষিক মহড়া, কর্মশালা এবং সেমিনারে গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানায়। এর ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং প্রয়োজনে এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ করতে হবে। সন্ত্রাস দমনে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষাবিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। সামরিক বাহিনীর সংবাদ প্রতিবেদনগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ করে তুলতে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মিলিতভাবে কাজ করা আবশ্যক। গণমাধ্যমকে সামরিক বাহিনীর পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে পাওয়ার উৎকৃষ্ট সময় শান্তিকাল, যে বন্ধু সংঘাতবিহীন শান্তিকালের পাশাপাশি যুদ্ধ, সংকট কিংবা সংঘাতের সময়েও পাশে থাকবে।

অন্যদিকে, সময়মতো প্রয়োজনমাফিক সংবাদ প্রতিবেদন তৈরিতে ও তা প্রচারে গণমাধ্যমের প্রয়োজন সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত সঠিক তথ্য, যার ফলে অতিরঞ্জন ঠেকানো সম্ভব হবে। সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক প্রচারণা দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাক্ষাৎকার প্রদান এবং বিভিন্ন বিশেষ দিবসে, যেমন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস এবং সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত টক শোগুলোতে অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে হবে। তথ্যের প্রবাহের জন্য পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সামরিক বাহিনী গণমাধ্যমের সমালোচনা এবং সত্যিকারের ভ্রান্তিগুলোকে স্বীকার করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন যৌক্তিক সুপারিশ, পরামর্শ গ্রহণ ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণে সাহায্য করতে পারে। অপরপক্ষে সামরিক বাহিনীকে নিয়ে অসংলগ্ন এবং উত্তেজনামূলক কোনো তথ্য প্রচার গ্রহণযোগ্য নয়, যা কি না জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর অথবা, যা জনমনে

ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব রয়েছে বাহিনী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তুলনামূলক কম ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা। গ্রাহকের সন্তুষ্টি সাধনের ওপরেই ব্যবসায়ীর সাফল্য নির্ভর করে, যা একইভাবে কার্যকর গণমাধ্যম সম্পৃক্তির বিষয়েও প্রযোজ্য। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক গড়তে হলে সামরিক বাহিনীর উচিত গণমাধ্যমের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তা পূরণে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করা।

বস্তুত ভবিষ্যতে সুফল পেতে হলে আমাদেরকে প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কার করতে হবে এবং নতুনত্ব আনতে হবে। বর্তমানে সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামরিক বাহিনীতে অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত থাকতে পারে। তারা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সামরিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে নিজেদের আরও যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। গণমাধ্যমের সঙ্গে ফলপ্রসূ সম্পর্ক উন্নয়নে এ ধরনের নিয়োগ ও শিক্ষা গ্রহণ পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনে সহায়ক হবে।

দ্রুতগতিতে বদলে যাওয়া বিশ্বে প্রতিকূল পরিবেশে সামরিক বাহিনীকে আর সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এবং সম্ভাব্য ইতিবাচক পদক্ষেপের বিপরীতে অর্জনগুলো মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মক্ষম নিরাপত্তার সঙ্গে প্রবেশাধিকারের মানদণ্ড, অনুষ্ঠানের পটভূমি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সামঞ্জস্য সাধনে সামরিক বাহিনী যাতে গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে, সে বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে। একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান, পরস্পরের সংস্কৃতিকে অনুধাবন এবং প্রয়োজন মেটাতে বাস্তবানুগ অভিব্যক্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারলে সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যম উভয়েই লাভবান হতে পারবে।

গণমাধ্যমের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে জড়ানোর সমস্যা হচ্ছে এর সফলতা হিসাব করা খুব কঠিন। সামরিক বাহিনীকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, পৃথিবীতে পরিপূর্ণ রাষ্ট্র বলে কিছু নেই, বরং পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কার্যকর রাষ্ট্রের ক্রিয়াশীলতা চিহ্নিত হয়। এ কারণেই সামরিক বাহিনীকে গণমাধ্যম সংস্থাগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আসলে গণমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের অভ্যন্তরেই নিহিত। যখন সঠিক ও সুন্দরভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা যাবে, তখন বিষয়টি সহজতর হবে, আর সামরিক বাহিনীও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে মিলেমিশে কাজ করতে পারবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী গণমাধ্যমের কাছ থেকে বহুমুখী সুবিধা নিতে পারে। নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের গুরুত্বকে আরও সামনে আনতে পারে :

- সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যম সম্পর্ককে দৃঢ় করার বিষয়াবলি গণমাধ্যমে তুলে ধরে অধিকতর কার্যকরী সম্পর্কের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে পারে।

● সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যে বিদ্যমান প্রথাগত ধারণা বিলোপ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নয়নের স্বার্থে উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মেলনের আয়োজন করা যেতে পারে।

● সামরিক বাহিনী সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও শিক্ষাবিষয়ক সভায় নিয়মিত অংশ নিতে গণমাধ্যমকে আমন্ত্রিত করতে পারে।

● একটি গণযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে তুলতে দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

● মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিরক্ষা সাংবাদিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

● দ্রুতগতিতে বদলে যাওয়া বৈশ্বিক পরিস্থিতির আলোকে যুগোপযোগী গণমাধ্যম নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে।

● প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলি জ্ঞাত রাখতে গণমাধ্যমকে নিয়ম অনুযায়ী সামরিক বাহিনীতে সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার প্রদান অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

● সামরিক বাহিনী তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের পাঠ্যক্রমে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা এবং মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে সংযুক্ত কিংবা সমৃদ্ধ করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যমকে পরস্পরের বর্তমান সম্পর্কের ভালো-মন্দ দিক চিহ্নিত করতে আগ্রহী হতে হবে। দুই প্রতিষ্ঠান কখনোই সম অবস্থায় আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অমিলগুলোকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণমাধ্যমকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের একটি জুতসই পরিকল্পনা সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যমের সম্পর্ক উন্নয়নের সফলতার চাবিকাঠি। এটা অবশ্যই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় হতে হবে এবং সে সঙ্গে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সংলাপগুলোকে অবশ্যই হতে হবে সত্যনিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট।

এমন বাস্তবতায় কেবল তখনই বলা যাবে, দায়িত্বশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো ঝামেলা ছাড়াই সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যমের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমোন্নতি ঘটবে। জাতীয় লক্ষ্য অর্জন এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য বাংলাদেশে এ দুই পক্ষকে অবশ্যই সহযোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যমের মাঝে সহযোগিতামূলক অটুট বন্ধন হওয়াটা হয়তো সময়সাপেক্ষ। কিন্তু একে অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলে এ বন্ধন আরো গতি পাবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সামরিক বাহিনী এবং গণমাধ্যমের মধ্যে একটি উপযুক্ত ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে। শান্তিকালীন উভয় পক্ষ যদি যূথবদ্ধভাবে চলতে পারে, তাহলে উত্তেজনা এবং সংকটকালে উভয় প্রতিষ্ঠান আরও সুসংহতভাবে কাজ করতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১. http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=197760

২. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a437519.pdf

৩. http://www.defencejournal.com/2000/aug/role-media-war.htm

৪. http://www.moi.gov.bd/

৫. http://www.army.mil/article/89611/

৬. http://www.thedailystar.net/op-ed/military-media-interface-constant-effort-144127

কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ (সি), পিএসসি, বিএন, ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে কমিউনিকেশন এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার বিষয়ে স্পেশালাইজেশন কোর্স সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর থেকে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ থেকে ডিফেন্স স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তিনি নৌ সদরসহ নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটিতে অধিনায়ক, স্টাফ অফিসার ও প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তদানীন্তন সুদানে (বর্তমানে দক্ষিণ সুদান) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স রিভারাইন ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরের গণমাধ্যম শাখায় গ্রেড-১ স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত আমাদের শান্তিরক্ষীরা

উইং কমান্ডার আ ন ম আব্দুল হান্নান, শিক্ষা

প্রাণিজগতের সৃষ্টি থেকেই সম্ভবত 'শান্তি' শব্দটির উৎপত্তি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এ বিশ্বনিখিল সৃষ্টি করেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ্ পাক নিজে শান্তিপ্রিয় ও সৌন্দর্যপ্রিয় এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবজাতি তথা সমগ্র প্রাণিজগৎকে শান্তিপ্রিয় হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। 'শান্তি' একটি আপেক্ষিক শব্দ। বাংলা অভিধানে 'শান্তি' শব্দটির অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমন– শমগুণ, প্রশান্তি, উৎকণ্ঠাশূন্যতা, চিত্তস্থৈর্য, বিবৃত্তি, বিরাগ, বিরাম, উপশম, উপদ্রবহীনতা, উৎপাতশূন্যতা, অবসান, সমাপ্তি, সন্ধি, যুদ্ধাবসান, কল্যাণ, বিশ্রাম ইত্যাদি। শান্তি এবং এর প্রতিটি প্রতিশব্দই একজন মানুষের কিংবা একটি পুরো মানবজাতির কল্যাণের প্রতিধ্বনি।

শান্তি এমন একটি বিষয় যে, প্রতিটি মানুষই তা পেতে চান। আবার শান্তি বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'শান্তিই শান্তির শত্রু', 'শান্তিই শান্তির প্রতিবন্ধক'। কারণ হলো মানুষ তাঁর নিজের শান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে অন্যের শান্তি বিঘ্নিত করে। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ তাঁর 'শান্তির' নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এখানেই 'শান্তির' বিপত্তি। মানবমনের ভ্রান্তি আর সংশয় থেকেই অশান্তির উৎপত্তি। শান্তি আসলে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানবমনের মৌলিক ও স্থায়ী একটি স্থাপনা। মানুষ কিংবা কোনো প্রাণীর সৃষ্টিই হয় শান্তিসহকারে। শান্তি খুঁজতে বাইরে যেতে হয় না; বরং নিজের মধ্যেই মানুষের জন্য রয়েছে অফুরন্ত শান্তির প্রাসাদ। সে প্রাসাদের অন্ধকারে আমরা যখন আলো জ্বালাতে ভুলে যাই কিংবা ব্যর্থ হই, তখন আঁধার আরও ঘনীভূত হয়। আঁধার মানেই অশান্তি। আঁধারের বিপরীত শব্দ আলো। আর আলো মানেই শান্তি। নিজের ঘরের আলো জ্বালানোর কোনো উপকরণ যখন আমরা পাই না, তখনই আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হই, উদ্বিগ্ন হই; শান্তি হারানোর ভয়ে ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করি। তিল তিল করে গড়ে তোলা সৌন্দর্য গুঁড়িয়ে অসুন্দরে পরিণত হয়। শাশ্বত কাঙ্ক্ষিত 'শান্তি' ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আজন্ম লালিত স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। তবুও বাঁচতে হয়। বাঁচার ইচ্ছেটা আসলে 'শান্তি-অশান্তির' গণ্ডিকে অতিক্রম করে চলে যায় বহুদূরে। শান্তি কিংবা অশান্তি যাই হোক, বাঁচতে হবে। কিন্তু মানুষ যখন শান্তি-অশান্তির গণ্ডি অতিক্রম করে বেঁচে যান, তখন শান্তির নিশ্চয়তা চান। তাই তো নিজের ঘরের অন্ধকার ঘোচানোর জন্য মানুষ চিৎকার করে। চিৎকারে সাড়া দিয়ে প্রতিবেশী বন্ধু বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত। আলোকবর্তিকা নিয়ে দৌড়ে আসেন প্রতিবেশীর ঘরের আঁধার ঘোচাতে। আলোর কাছে অন্ধকার হয় পরাজিত, শান্তির কাছে অশান্তির হয় পরাজয়। নরম আলোর পরশে আঁধার ঘরের সকল আঁধার ঘুচে যায়। ঘরে আসে শান্তি।

সমগ্র বিশ্বকে আমরা একটি ঘরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আঁধারে যেমন একটি ছোট্ট ঘরের শান্তি বিনষ্ট হয়, তেমনি মানবমনের অস্থিরতায় নিজের সুখ নষ্ট হয়। একজনের সুখ বিঘ্নিত হলে প্রতিবেশীদের সুখ বিনষ্ট হয়। এমনিভাবে একটি দেশ, একটি জাতি এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হয়। একজন মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হলে তিনি তাঁর শান্তি পুনরুদ্ধারে এমন একজন প্রতিবেশীকে সাহায্যের জন্য ডাকবেন, যিনি অত্যন্ত

শান্তিপ্রিয় মানুষ। শান্তি যার কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তেমনিভাবে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হলে জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করে, যে দেশ ও জাতি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ।' বাঙালি জাতি এমন একটি জাতি, যে জাতি শৃঙ্খলা আর ঐক্য দিয়ে হায়েনারূপী শত্রুর কবল থেকে প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে।

তাই শান্তিরক্ষী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম সবার শীর্ষে। বিশ্বশান্তি আর বাঙালি জাতি তথা বাংলাদেশ এক সুতোয় গাঁথা। একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায় না। বিশ্বের যে প্রান্তেই শান্তি বিঘ্নিত হোক, বাংলাদেশের কথা সবার আগে স্মরণ করা হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হওয়ার জন্য প্রত্যাশা করে।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে এ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বীরদর্পে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাজিত করে বাঙালি জাতিকে স্বাধীন করেছিলেন, তেমনি শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকার সম্মান রক্ষার্থে এ দেশের বীর সৈনিকরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন না। শান্তি যেন নারীর ন্যায় বীরভোগ্য। যে জাতির বীরত্বের খ্যাতি যত বেশি, সে জাতির স্বাধীনতা ততটাই নিরাপদ। যে জাতির স্বাধীনতা যতটা নিরাপদ, সে জাতির শান্তিও ততটাই নিরাপদ। 'জান দেব– মান নয়' এই মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিক। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত আমাদের সৈনিকরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শে দীক্ষিত। তাঁদের মহান কর্তব্য পালনের সময় তাঁরা তিরিশ লাখ শহীদের পবিত্র রক্ত আর দুই লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের মহাপবিত্র ইজ্জতের কথা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন। আমাদের শান্তিরক্ষীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, যাঁরা তাঁদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের শান্তিরক্ষীরাও সদা প্রস্তুত তাঁদের বর্তমানকে উৎসর্গ করতে বিশ্ববাসীর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। বিশ্বকে বাসযোগ্য করার জন্য এবং মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাতে থেকে রক্ষা করার জন্য ওরা সদা প্রস্তুত। ওদের কাছে :

'জগৎ জুড়িয়া আছে– এক জাতি
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত;
একই রবি শশী মোদের সাথী।'

পরের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমাদের শান্তিরক্ষীরা নিজেদের জীবনকে আনন্দময় করতে চান। পরোপকারের মহৎ আদর্শে তারা সদা উদ্দীপ্ত। পৃথিবীর শান্তিবিঘ্নিত বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের মানবিক গুণাবলি, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ, সাহসিকতা আর বীরত্ব বাঙালি জাতিকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বীরের জাতি এবং শান্তির জাতি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। বাঙালি জাতি তার সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে গর্বিত। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা

স্বাধীনতার মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই আমরাও কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

‘যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না ঘরে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে, সে-ই শুধু রবে–
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।’

উইং কমান্ডার আ ন ম আব্দুল হান্নান, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শিক্ষা শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও ইউনিটে তিনি প্রশিক্ষণ ও স্টাফ ডিউটি পালন করেন। এ ছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে জিএসও-২ (পিঅ্যান্ডসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মিলিটারি অবজারভার হিসেবে তিনি লাইবেরিয়ায় দায়িত্ব পালন করেন। পাবনা ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে তিনি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিচুক্তি-পরবর্তী আর্থসামাজিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন খান, পিএসসি,জি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে উপজাতিদের বিতর্কিত ভূমিকা এবং স্বাধীনতা-উত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে তাদের দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতো জীবনধারণের আহ্বান জানায়। সরকারের এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তারা সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নেয় এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পথ পরিহার করে সুস্থ ও উন্নয়নমুখী জীবনধারণের পথে নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও পার্বত্যাঞ্চলে মোতায়েন করে। সেনাবাহিনী ১৯৭২ সাল থেকে সার্বিক পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা বিচারে অপারেশন বাঘের থাবা, অপারেশন আয়রন ফিস্ট, অপারেশন ড্রাগন ড্রাইভ, অপারেশন ডিগ আউট, অপারেশন ট্রাইডেন্ট, অপারেশন পাঞ্চিং টাইগার, অপারেশন দাবানল এবং বর্তমানে অপারেশন উত্তরণের আওতায় কাজ করছে। এই অপারেশনের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখা, বেসামরিক প্রশাসনকে তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সাহায্য করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সর্বোপরি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে।

একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রামকে রোধ করতে সামরিক অভিযানের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টারও প্রয়োজন রয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সংগ্রামের পেছনে নানাবিধ কারণের মাঝে আর্থসামাজিক কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে এসব সংগ্রামকে স্থায়ীভাবে প্রশমিত করা সম্ভব। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সুনিশ্চিত আশ্বাস ও তার বাস্তবায়ন হলে এসব গোষ্ঠী স্বভাবতই সংগ্রামের পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। এই দূরদৃষ্টি নিয়েই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলকে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

চিত্র-১ ও ২ : শান্তিচুক্তি ও অস্ত্র সমর্পণ

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে এক নতুন যুগের সূচনা করে। উপজাতিরা সন্ত্রাসের পথ ভুলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ বেছে নেয়। এ চুক্তি পাহাড়ে সন্ত্রাস নির্মূলে টনিকের মতো কাজ করে। উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাভাবনার অবসান ঘটিয়ে মূলধারায় কাজ করতে থাকে। শান্তিচুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডেও যুক্ত

হয় এক নতুন মাত্রা।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করার পাশাপাশি তারাও যোগ দেয় এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। সরকারের বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস পরিবর্তন আনতে থাকে পার্বত্যাঞ্চলে। এখন পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি বাঙালিরা হানাহানি ও সন্ত্রাস ভুলে গিয়ে উন্নয়নের জন্য এক ছাতার নিচে কাজ করছে। সেনাবাহিনী কখনও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়, আবার কখনও বা জনগণ, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও বেসামরিক প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করছে। এসব উদ্যোগ পার্বত্যাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সেনাবাহিনী শান্তিচুক্তির পূর্বেও অনেক আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তি পরবর্তীকালে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি তা আরও বেগবান হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার নিরিখে এটা অনস্বীকার্য যে, সেনাবাহিনী পার্বত্যাঞ্চলের সর্বস্তরের জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করছে। এই বাস্তবতা স্বীকার করেই ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে রাঙামাটিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সন্তু লারমা বলেন, 'একটা সময় সবাই মনে করত, জনগণের সঙ্গে সেনাবাহিনী থাকা ঠিক নয়। কিন্তু এখন সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। সেনাবাহিনী নানাভাবে দেশ ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করছে।'

সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

নাগরিকের মৌলিক অধিকার, যেমন : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি পূরণে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য ভিজিএফ কার্ড প্রদান, বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে বস্ত্র বিতরণ, পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ নির্মাণ করে শিক্ষার প্রসার এবং হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পল্লী চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছে। এসব মৌলিক চাহিদার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। সেনাবাহিনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের পাশাপাশি এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতি, পাহাড়িদের কর্মদক্ষতা ও কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে তিন পার্বত্য জেলায় নানাবিধ আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এই কর্মযজ্ঞ নেহাত কম নয়। লেখার পরিধি সীমিত রাখার জন্য, সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর দু-একটি কর্মকাণ্ড এবং নির্দিষ্টভাবে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা রিজিয়নের অধীন ছয়টি জোনের মধ্যে শুধু সেনাবাহিনীর তিনটি জোন কর্তৃক গৃহীত কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-৩ ও ৪ : গুইমারা রিজিয়নের সংগঠন ও দায়িত্বপূর্ণ এলাকা

কৃষির উন্নয়ন

সমন্বিত কার্যক্রম। সেনাবাহিনীর প্রতিটি ক্যাম্প এলাকায় প্রতি মাসে একটি সমন্বিত কার্যক্রম (One Stop Service) পরিচালিত হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমে উপজেলা কৃষি, মৎস্য, পশু চিকিৎসক, বন কর্মকর্তাসহ সব বিভাগের কর্মকর্তাদের একত্র করে বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় স্থানীয় লোকদের মধ্যে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু ও বনসম্পদের ওপর পরামর্শ দেওয়া হয়। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, গুটি ইউরিয়া ও স্বাস্থ্যসম্মত কীটনাশকের ব্যবহার, অনাবাদি ভূমিকে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা এবং বনায়নে উৎসাহী করে তোলা হয়।

এর ফলে কৃষিতে এসেছে নতুন জোয়ার, যার মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি মিটিয়েও তারা কিছু উদ্বৃত্ত করে সচ্ছল জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠছে বিভিন্ন পশু পালন খামার।

চিত্র-৫, ৬ ও ৭ : সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত কার্যক্রম (One Stop Service)

সেচ ব্যবস্থা। পার্বত্যাঞ্চলের অনেক আবাদযোগ্য ভূমি সেচের অভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না কিংবা প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে শুধু একটি ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারলে এসব জমিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনী স্থানীয়দের সমবায় সমিতির মাধ্যমে একত্র করে গভীর নলকূপ স্থাপনে সহায়তা করছে। এতে বিভিন্ন এলাকা একদিকে যেমন সেচের আওতায় আসবে, অন্যদিকে স্থানীয়দের খাবার পানির অভাব দূর করবে। এরূপ একটি প্রকল্প হলো সিন্দুকছড়ি গভীর নলকূপ প্রকল্প, যার মাধ্যমে ৫০০ একর জমি সেচের আওতায় এনে তিনটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পথে।

চিত্র-৮ ও ৯ : গভীর নলকূপ প্রকল্প

বনায়ন। পার্বত্যাঞ্চল একসময় বনজ ও ফলদ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সময়ের পরিক্রমায় এবং কিছু দুষ্টচক্রের বিবেকহীন ও স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ডে বনসম্পদ আজ প্রায় ধ্বংসের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। বনসম্পদ রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনও নিজ ব্যবস্থাপনায়, আবার কখনও বা বিভিন্ন এনজিও ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বনায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এ ছাড়া পরিত্যক্ত ভূমিতে বনায়নে জনসাধারণকে উৎসাহিত করছে।

গুইমারা রিজিয়নের অধীন সেনাবাহিনীর তিনটি জোন কর্তৃক এক বছরে বপনকৃত বৃক্ষের তালিকা নিম্নরূপ :

জোন	বপনকৃত বৃক্ষের সংখ্যা
মাটিরাঙ্গা	১৫০০০টি
সিন্দুকছড়ি	৩০০০০টি
লক্ষ্মীছড়ি	২০০০০টি
মোট	৬ ৫০০০টি

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

অবকাঠামো উন্নয়ন ও অনুদান। পার্বত্য এলাকার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষকে ভেতর থেকে আলোকিত করে, উদার করে এবং ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা তৈরি করে। মানুষ তখন অন্যায়ের পথ ভুলে ন্যায় ও মঙ্গলের পথে পা বাড়ায়। পার্বত্যাঞ্চল অন্যান্য এলাকা থেকে শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। প্রাতিষ্ঠানিক মূলধারার শিক্ষার মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে উপজাতিদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাভাবনার অবসান ঘটিয়ে তারা মূলধারার নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়বে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও পার্বত্য এলাকায় অনেক স্কুল-কলেজ নির্মিত হয়েছে। এসব স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে সেনাবাহিনী প্রতি মাসে একটি বৈঠক করে থাকে। এর মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যা সমাধানের পথ নিরূপণ করা হয়। এ ছাড়া সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের বেতন, বই বিতরণ, শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, আর্থিক অনুদান, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী দিয়ে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা থাকলে সেনাবাহিনী নিজ খরচে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। কখনও কখনও সেনাসদস্যরা সরাসরি শিক্ষাদান করে থাকেন।

চিত্র-১১, ১২ ও ১৩ : সেনাবাহিনী কর্তৃক শিক্ষাসামগ্রী প্রদান

সেনাবাহিনী কর্তৃক দিবা ও নৈশ স্কুল পরিচালনা। সেনাবাহিনীর প্রায় প্রতিটি জোনই নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে একটি করে স্কুল পরিচালনা করে থাকে। স্কুলের অবকাঠামো থেকে শুরু করে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, ছাত্রছাত্রী পরিবহনসহ সবকিছুই উক্ত জোন কর্তৃক বহন করা হয়ে থাকে। গুইমারা রিজিয়ন কর্তৃক দুটি স্কুল, যথা– শহীদ (লে.) মুশফিক বিদ্যালয় এবং শহীদ আফতাব কাদের মডেল

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এ ছাড়া এর অধীন সিন্দুকছড়ি, মাটিরাঙ্গা ও লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন কর্তৃক নিজ ব্যবস্থাপনা ও খরচে দুটি করে নৈশ স্কুল পরিচালিত হয়।

চিত্র-১৪, ১৫ ও ১৬ : সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত দিবা ও নৈশ স্কুল

শিক্ষা সেমিনার। পার্বত্যাঞ্চল দুর্গম হওয়ায় শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত। শিক্ষাকে সর্বাগ্রে নিয়ে আসার জন্য সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, শিক্ষকের বেতন ভাতা প্রদান, অন্যান্য সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ ছাড়া গুইমারা রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার প্রায় ৭০০ শিক্ষক ও স্কুল কমিটির প্রতিনিধি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সকল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এমপির মাধ্যমে একটি শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মানসম্মত ও কর্মঠ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। গুইমারা রিজিয়ন প্রতিবছরই এরূপ সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। শিক্ষা বিস্তারে এ ধরনের আয়োজন অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে।

চিত্র-১৭ ও ১৮ : সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সেমিনার

সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচি। মানসিক বিকাশ ও প্রতিভা প্রস্ফুটনে সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচির বিকল্প নেই। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি চাই নানা ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম। কুইজ, বিতর্ক, বানান প্রভৃতি নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটবে। জ্ঞানের নানামুখী চর্চায় সুযোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিটি জোনের আওতাধীন স্কুলগুলোর মধ্যে আন্তঃস্কুল বিতর্ক, বানান ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সেনাবাহিনী। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সুকৌশলে পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যা নিরসনের উপায়, সহিংসতার কুফল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির চেতনা এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পার্বত্যাঞ্চলের তরুণ সম্প্রদায় নানাবিধ কারণে খেলাধুলায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অথচ এ অঞ্চলের তরুণদের মেধা ও ক্রীড়াশৈলী

চিত্র-১৯ ও ২০ : আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

অনেক ভালো। তাই মানসিক বিকাশ, প্রতিভা অন্বেষণ ও সামাজিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুলগুলোতে নানা ধরনের খেলাধুলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গুইমারা রিজিয়নের অধীন সব জোনের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে স্কুল পর্যায়ে ভলিবল ও ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা পরিচালনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ছাড়া এতে করে তাদের ক্রীড়া প্রতিভার অনুসন্ধান ও বিকাশের সুযোগ হয়ে থাকে। গুইমারা রিজিয়নের উদ্যোগে পরিচালিত নানা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা পরিচর্যা ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে অচিরেই বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

চিত্র-২১ ও ২২ : আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা । পার্বত্যাঞ্চলের স্কুল-কলেজসমূহে বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বছরের বিশেষ দিনগুলো, যেমন– বৈসাবি, শান্তিচুক্তি, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী প্রভৃতিতেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তরুণ সম্প্রদায়ের মানসিক বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তারা সমাজের নানাবিধ কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের রয়েছে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি, যা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই ভিন্ন। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এসব প্রতিযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজাতীয় ও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রীতির বীজ বপিত হয়। সাংস্কৃতিক মনোভাবের বিকাশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব থেকে তরুণদের দূরে রেখে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

চিত্র-২৩ ও ২৪ : স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন

পার্বত্য জেলাসমূহে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতা ছিল । দুর্গম এলাকা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জটিলতার কারণে যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। বর্তমান সরকারের দক্ষ পরিকল্পনায় পার্বত্যাঞ্চলে চিকিৎসাক্ষেত্রে অবকাঠামোগত প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সরকার হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পল্লী চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছে।

এ ছাড়া সর্বশেষ ৩৩তম বিসিএসের (চিকিৎসা) মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসাসেবাকে পাহাড়িদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। চিকিৎসাসেবায় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রতিটি ক্যাম্প এলাকায় প্রতি মাসে একটি সমন্বিত চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া প্রয়োজন সাপেক্ষে ক্যাম্প এবং জোন এলাকায় যেকোনো সময় যেকোনো রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর জোনগুলো নিজ অর্থায়নে বিশেষ চিকিৎসা সহায়তা, যেমন– চক্ষুশিবিরের মাধ্যমে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা দল প্রেরণের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিয়ে থাকে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকের উপস্থিতির ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং সিভিল সার্জনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। সেনাবাহিনী চিকিৎসা কার্যক্রম মূলত তিনটি স্তরে হয়ে থাকে :

- **জোন পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা।** ক্যাম্পসমূহে নিয়মিত মাসিক কর্মসূচির আওতায় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়ে থাকে। জোন সদর থেকে মেডিকেল অফিসার প্রেরণ করে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ নিয়মিতভাবে চিকিৎসাসেবা পেয়ে থাকেন।

- **ভ্রাম্যমাণ সেনা চিকিৎসাকেন্দ্র।** ক্যাম্পে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ সেনা চিকিৎসাকেন্দ্র দ্বারা দুর্গম ও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

- **বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইন।** পার্বত্যাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে চক্ষুর বিশেষায়িত চিকিৎসা দিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বার্ষিকভাবে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। এসব ক্যাম্পেইনে সেনাবাহিনীর নিজস্ব অর্থায়নে বিশেষ চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধ প্রদান ও চক্ষু অপারেশন করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন জোন কর্তৃক এক বছরে চিকিৎসাকৃত সাধারণ রোগীর সংখ্যা এবং চক্ষুশিবিরের মাধ্যমে চক্ষু রোগীর সংখ্যা ও চক্ষু অপারেশনকৃত রোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

সাধারণ রোগী		চক্ষুশিবিরের মাধ্যমে চিকিৎসাকৃত রোগী	
জোনের নাম	রোগীর সংখ্যা	চক্ষু রোগীর সংখ্যা	চক্ষু অপারেশনকৃত রোগীর সংখ্যা
রিজিয়ন সদর	২১৬০০ জন	-	-
লক্ষ্মীছড়ি জোন	৮১০০ জন	৯২৩ জন	৪৫ জন
সিন্দুকছড়ি জোন	৪২০০ জন	-	-
মাটিরাঙ্গা জোন	১৪৪০০ জন	৮০০ জন	৩৬ জন
মোট	৪৮৩০০ জন	১৭২৩ জন	৮১ জন

চিত্র-২৫ : ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

চিত্র-২৬ : জোন পর্যায়ে চিকিৎসা কার্যক্রম

চিত্র-২৭ : চক্ষুশিবির

কর্মসংস্থান সৃস্টি

সেনাবাহিনী তাদের ক্ষুদ্র পরিসরে নিজ ব্যবস্থাপনায় পাহাড়িদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে দিচ্ছে। পাহাড়িদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাপ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সেনাবাহিনী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পার্বত্য এলাকায় মোতায়েনকৃত প্রতিটি রিজিয়নই বিভিন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শুধু গুইমারা রিজিয়ন কর্তৃক গৃহীত দু-একটি পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

চিত্র-২৮ ও ২৯ : সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পাহাড়িকা তাঁত প্রকল্প

● **পাহাড়িকা তাঁত প্রকল্প।** লক্ষ্মীছড়ি জোন কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে পাহাড়ি নারীরা উলের শাল, মাফলার, ওড়না ও গামছা বানিয়ে থাকে। হাতে তৈরি বলে এগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করে। এর চাহিদাও প্রচুর। এর মাধ্যমে প্রায় ১০ জন পাহাড়ি নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। পাহাড়িকা-২ নামে এরই মধ্যে আরেকটি প্রকল্প শুরু হয়েছে, যেখানে ৮০ জন পাহাড়ি নারী এসব জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্পের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

● **সেলাই প্রশিক্ষণ।** লক্ষ্মীছড়ি, সিন্দুকছড়ি ও মাটিরাঙ্গা জোন কর্তৃক সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাহাড়ি নারীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। প্রশিক্ষণের পর তাদের সেলাই মেশিন দেওয়া হয় যেন তারা নিজেরাই অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে; অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ কাপড় সেলাই ছাড়াও ব্যবসাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া কয়েকজনকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে সেলাই কাজের বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন জোন কর্তৃক এক বছরে সেলাই প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

চিত্র-৩০ : সেলাই প্রশিক্ষণ

জোনের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
লক্ষ্মীছড়ি জোন	১২০
সিন্দুকছড়ি জোন	৯০
মাটিরাঙ্গা জোন	১০১
মোট :	৩১০

● **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।** কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও সেনাবাহিনী পাহাড়ি জনসাধারণকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত হয়ে অনেকেই স্থানীয় বাজারে দোকান খুলে অন্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কিংবা বিভিন্ন সংস্থায় কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে চাকরি করছে। বিভিন্ন জোন কর্তৃক এক বছরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

চিত্র-৩১: কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

জোনের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
লক্ষ্মীছড়ি জোন	৯০
সিন্দুকছড়ি জোন	২৯
মাটিরাঙ্গা জোন	৪৮
মোট :	১৬৭

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পার্বত্যাঞ্চলের দুর্গমতা অনেকটা সেনা নির্মাণ বিভাগের দ্বারা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে। বান্দরবানের রুমা-থানচি সড়ক, আলীকদম-থানচি সড়ক, আজিজনগর-রুমা সড়ক ইত্যাদি সার্বিকভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে বাঘাইহাট-সাজেক সড়কটিও সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্মিত হচ্ছে। রাজস্থলী-ফারুয়া-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বড়কল সড়কটিও সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন আছে। রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক, মানিকছড়ি-মহালছড়ি সড়ক, ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-রাজস্থলী সড়কের মেরামত ও পুনর্বাসন দায়িত্বটিও সেনাবাহিনীর ওপর অর্পিত আছে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জোনের তত্ত্বাবধানে বেসামরিক প্রশাসন এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে রাস্তার উন্নয়ন, বাঁধ সংস্কারসহ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে থাকে। কখনো কখনো বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেও সেনাবাহিনী রাস্তার সংস্কারকাজ করে থাকে। যোগাযোগ উন্নয়ন সপ্তাহ পালন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-৩২ ও ৩৩ : সেনাবাহিনী কর্তৃক রাস্তা ও বাঁধ মেরামত

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়ন

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ নানা উপজাতির বাস। এদের পাশাপাশি প্রচুর বাঙালিও এসব এলাকায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধই এদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে অবদ্ধ রেখেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দৈনন্দিন কার্যক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতির বন্ধন জোরদার করে তোলে। সেনাবাহিনী জোন এবং রিজিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

এই টুর্নামেন্টগুলো থেকে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নিয়ে আরও বড় পরিসরে আন্তঃজোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দ, সম্প্রীতি ও বিনোদনের একটি মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষ সংগঠক ও আয়োজক সৃষ্টির পথেও এই টুর্নামেন্টগুলো একেকটি মাইলফলক। পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনী কর্তৃক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহিরাগত শিল্পীদের দ্বারা কনসার্ট ছাড়াও সব সম্প্রদায়ে নাচ ও গান প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী, সন্ত্রাসবিরোধী, মানব-সম্পদ উন্নয়ন এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য নানা প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে।

চিত্র-৩৪ : সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

চিত্র-৩৫ : ভলিবল প্রতিযোগিতা

বৈসাবি উৎসব পালন। পয়লা বৈশাখে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের জনসাধারণ বৈসী, সাংগ্রাই ও বিযু উৎসব পালন করে থাকে। এটি তাদের সবচেয়ে বড়

উৎসব। তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও দৃঢ় করার জন্য রিজিয়নের পক্ষ থেকে বৈসাবি মেলা, কনসার্ট, যাত্রাপালাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ১৪২২ বাংলা বছরে একটু ভিন্ন ধারায় বৈসাবি অনুষ্ঠান বৈসাবিন নামে পালন করা হয়। যার ন-দিয়ে বাঙালি সম্প্রদায়ের পয়লা বৈশাখ উদযাপনকে বোঝানো হয়েছে। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির এক নজিরবিহীন উদাহরণ হয়ে থাকবে। সব সম্প্রদায়ের কাছেই বৈসাবিন নামকরণটি সমাদৃত হয়েছে।

চিত্র-৩৬ : বৈসাবিন র‍্যালি

চিত্র-৩৭ : বৈসাবিন মেলা

চিত্র-৩৮ : বৈসাবিন কনসার্ট

পর্যটনশিল্পের বিকাশ

খাগড়াছড়ির সাজেক পর্যটন এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত রিসোর্ট স্থাপন, নীলগিরিতে রিসোর্ট নির্মাণ, কাপ্তাই লেকের পাশে রিসোর্ট নির্মাণ এ পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ ছাড়া রিজিয়ন এবং জোন এলাকায় অবস্থিত পর্যটন এলাকা, যেমন– আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র, নুনছড়ি দেবতা পুকুর, বগালেক, বান্দরবান স্বর্ণ মন্দির, চিম্বুক হিল, কাপ্তাই লেক, শুভলং জলপ্রপাত প্রভৃতি পর্যটন এলাকায় পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী পর্যটনশিল্প বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পর্যটন-শিল্প বিকাশের দ্বারা স্থানীয় পাহাড়িদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় ও বেসরকারিভাবে পর্যটন উৎসাহিত হচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয়ভাবে পর্যটনশিল্পের আয় ও প্রসার অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

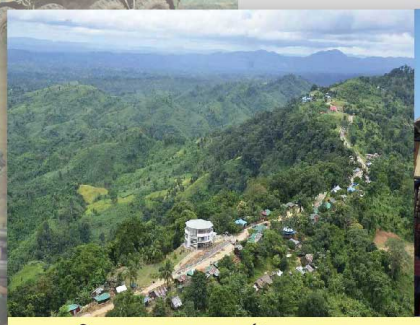

চিত্র-৩৯ : সাজেক পর্যটন এলাকা

চিত্র-৪০ : সাজেক পর্যটন এলাকা

চিত্র-৪১ : নীলগিরি পর্যটন এলাকা

আর্থিক সহায়তা

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন জোন কর্তৃক হতদরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতি মাসে নিরাপত্তা সম্মেলন শেষে এসব ব্যক্তির মধ্যে অর্থ বিতরণ করা হয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ে, সন্তানের শিক্ষার খরচ, গৃহনির্মাণের জন্য টিন, টিউবওয়েল স্থাপন এবং বিশেষ চিকিৎসার জন্য এই অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে আর্থিক অনুদান এবং নিজ অর্থায়নে সেনাবাহিনী শীতকালে শীতবস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য সরঞ্জাম বিতরণ করে থাকে।

চিত্র-৪২ : অনুদান প্রদান

চিত্র-৪৩ : এনজিওর মাধ্যমে সমন্বয়

চিত্র-৪৪ : শীতবস্ত্র বিতরণ

উপসংহার

অপারেশন উত্তরণের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজ হলো পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করে বেসামরিক প্রশাসনকে তাদের স্বাভাবিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পথ থেকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসা। শান্তিচুক্তির পর বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী তাদের ক্ষুদ্র সম্পদ ও জনবল দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসন ও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে তারা যে ভূমিকা রাখছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে চিন্তাবিদরা সেনাবাহিনীর এহেন কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, এই কর্মযজ্ঞ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন তথা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁদেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার সঙ্গে জড়িত এবং 'পার্বত্য প্রকাশ (অনুসন্ধান)', 'They are not Indigenous,' 'প্রান্তিক উপজাতি ও আদিবাসী' বইগুলোর লেখক আতিকুর রহমান বলেন, 'আজ পর্যন্ত সেনাবাহিনী উপজাতিদের মাঝে যে বিপুল পরিমাণ সেবা কার্যক্রম চালিয়েছে, মূল্যের হিসাবে তার পরিমাণ বহু শতকোটি টাকা অঙ্কের সমান। ওষুধ সরবরাহ, চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, কম্পিউটার ট্রেনিং, শিক্ষার্থীদের বই-পুস্তক দান, লাইব্রেরি ও ক্লাবসমূহে পুস্তক সরবরাহ, ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান, কিয়াং ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আসবাবপত্র দান, অভাবী ও রোগগ্রস্তদের চিকিৎসা ও নগদ সাহায্য, ক্ষতিগ্রস্ত কিয়াং, স্কুলঘর, ক্লাব ও যাত্রী ছাউনি মেরামত ও নির্মাণ, উপদ্রুতদের পুনর্বাসন গৃহনির্মাণ সাহায্য, বীজ, চারা ও আর্থিক অনুদানের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সহায়তা ইত্যাদি বিপুল সেবা অবদানকে একত্র করা হলে দেখা যাবে পরিমাণে এসব বিরাট কিছু এবং উপকাররূপেও এসবের অবদান অসামান্য।'

তথ্যসূত্র

১। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন' মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, বীর প্রতীক।

২। পার্বত্য প্রকাশ (অনুসন্ধান) আতিকুর রহমান– মার্চ ২০১৩ ইং।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : আনিসুল হক : এপ্রিল ২০১৪ ইং।

৪। They are not Inbigenous : Atiqur Rahman - March 2013.

৫। প্রান্তিক উপজাতি ও আদিবাসী : আতিকুর রহমান- মার্চ ২০১৩।

৬। দৈনিক প্রথম আলো– ২ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং।

৭। দৈনিক প্রথম আলো– ১৯ মার্চ ২০১৫ ইং।

কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন, পিএসসি, জি ২২ জুন ১৯৯০ সালে ২২তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। তিনি আর্টিলারি রেজিমেন্টের স্টাফ অফিসার ও ব্যাটারি অধিনায়কসহ বিভিন্ন নিযুক্তিতে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি এনসিওস একাডেমির প্রশিক্ষক, আর্টিলারি ব্রিগেডের জিএসও-৩ (অপারেশন) ও ব্রিগেড মেজর, ডিএএজি (রিক্রুটিং) বিআরইউ, এএজি (কল্যাণ) সেনাসদর, এজির শাখা (কল্যাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর) এবং দুটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুল, হালিশহর থেকে অফিসার্স গানারি স্টাফ কোর্স ও ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর থেকে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে স্টাফ অফিসার হিসেবে ও ২০১১ সালে আইভরি কোস্টে ব্যানব্যাট ৩/১৯-এ সিনিয়র অপারেশন্স অফিসার হিসেবে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বগুড়া শাখা ডিজিএফআই-এ কর্নেল জিএস হিসেবে কর্মরত আছেন।

রানা প্লাজা ভবন ধস : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নতুন মাত্রা

লে. কর্নেল মোহা. আমিরুল ইসলাম, পিএসসি, আর্টিলারি

'We cannot stop natural disasters but we can arm ourselves with knowledge: so many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness.'

-Petra Nemcova

ভূমিকা

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের যেখানে অবস্থান, সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি নিয়মিত ঘটনা। ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু রানা প্লাজা ধসের মতো আংশিক মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ঘটনা এ দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে। ২৪ এপ্রিল ২০১৩, বুধবার অন্যান্য দিনের মতো সাদামাটাভাবেই দিনটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু দিনের শুরুতেই সাভার বাজারের রানা প্লাজা নামের নয়তলা বাণিজ্যিক ভবন ধসে সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু এই সাধারণ দিনটিকে এক কালো দিবসে পরিণত করে। ভবনের অভ্যন্তরে কর্মরত হতভাগ্য এতগুলো লোকের রক্ত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ দিনটিকে ইতিহাসের পাতায় লালরঙে রঞ্জিত করেছে।

দেশের ক্রান্তিলগ্নে, মানবতার খাতিরে একটি জাতি যে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, রানা প্লাজা ধসের ঘটনা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অংশ নেওয়া এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বিশেষত, তাদের চিকিৎসকগণ, হাজারো স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী, রিকশাওয়ালা, ওষুধ কোম্পানি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবার নিরলস পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এরূপ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলার একটি সফল পরিসমাপ্তি ঘটে, যা ভেবে আমরা সকলেই গর্ববোধ করতে পারি। এ সফল পরিসমাপ্তির পেছনে ধারাবাহিক অসংখ্য ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না। রানা প্লাজা ভবনে আটকে পড়া অসহায় মানুষের বীভৎস ও মর্মান্তিক পরিণতি সবার মনে বহুদিন দাগ কেটে থাকবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের হাত-পা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে নয়তলা ভবনের ধ্বংসের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে ছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়া নেহাত ভাগ্যের ব্যাপার। আহত লোকদের করুণ আর্তনাদ ও উদ্ধার পাওয়ার আকুতিতে উদ্ধারকর্মীরা মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং আল্লাহর অশেষ কৃপায় তাঁরা বড় বড় বোল্ডার কেটে, ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে সমর্থ হন। বাঙালি জাতি আবারও প্রমাণ করল, যত বড় বিপদই আসুক না কেন, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ তা মোকাবিলার সামর্থ্য রাখে। আশা করা যায়, রানা প্লাজার উদ্ধার অভিযানের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ উদ্ধারকর্মীদের জন্য যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

এই লেখনীর মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে 'রানা প্লাজা ভবন ধস'-এর মর্মান্তিক ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে এর শিক্ষা হতে ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়ে আলোকপাতের একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

রানা প্লাজা ধস : সেই দুঃসহ স্মৃতি

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানার ইতিহাসে রানা প্লাজা ধসের ঘটনাটি সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। শুধু তা-ই নয়, আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে কাঠামোগত ত্রুটির কারণে ভবন ধসের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এরূপ ঘটনা বিরল। একাধিক তৈরি পোশাক কারখানা, একটি ব্যাংক, আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট এবং আরও দোকান নিয়েই রানা প্লাজার অবস্থান। ভবনে ফাটল চিহ্নিত করামাত্রই ভবনের নিচতলায় অবস্থিত দোকান ও ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ঘটনার মাত্র একদিন আগে ভবন ব্যবহার না করার জন্য জারি করা সতর্কতা উপেক্ষা করে তৈরি পোশাক কারখানার কর্মীদের কাজে আসতে বাধ্য করা হয়। তৈরি পোশাক কারখানার কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক কর্মীদের ভবনের ভেতরে প্রবেশ করানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবনটি ধসে পড়ে। রানা প্লাজার আর্কিটেক্ট মাসুদ রেজা বলেন, 'ভবনটি শুধু দোকান ও অফিসের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কারখানার জন্য নয়।' অন্য আর্কিটেক্টরাও দোকান ও অফিসের জন্য ডিজাইনকৃত ভবনের অভ্যন্তরে কারখানা স্থাপনের আসন্ন বিপদসমূহ সম্পর্কে জোর দেন। তাঁরা আরও লক্ষ করেন, ভবনটির কাঠামো কারখানার ভারী যন্ত্রপাতির কম্পন ও অতিরিক্ত ওজন বহনের মতো শক্তিশালী ছিল না। ২৪ এপ্রিল সকালে বিদ্যুৎ চলে গেলে ভবনটির নয়তলায় অবস্থিত ডিজেল জেনারেটরটি চালু করা হয়। সকাল ৮টা ৫৭ মিনিটে শুধু নিচতলা ছাড়া সম্পূর্ণ ভবনটি ধসে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা ভবনটি ধসের পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন :

- ভবনটি একটি পুকুর ভরাট করে অনুমোদন ব্যতীত তৈরি করা হয়েছিল।
- ভবনটিকে অনুমোদিত বাণিজ্যিক কাজের পরিবর্তে (যার জন্য পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছিল) অনুমোদিত তৈরি পোশাক কারখানার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল।
- পরিকল্পিত ছয়তলার ভবনে নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত তিনতলা তৈরি করা হয়েছিল।
- নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দ্বারা ভবন নির্মাণ করার ফলে নয়তলায় জেনারেটর চালু করার পর সৃষ্ট কম্পনের কারণে বর্ধিত ভার ভবনের দুর্বল কাঠামো ধরে রাখতে অক্ষম ছিল।

ভবন ধসের আনুমানিক ২০ মিনিটের মধ্যে ৯ পদাতিক ডিভিশন তার মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যবেক্ষক দল এবং একটি উদ্ধারকারী কোম্পানিকে ঘটনাস্থলে পাঠায়। ঘটনাস্থল দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় যে, একটি নয়তলা ভবন ধসে কীভাবে দোতলা উচ্চতার ভবনে পরিণত হতে পারে। হাজার হাজার মানুষ ভবনের নিচে চাপা পড়ে হতাহত হয়েছে আর কিছু মানুষ মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়ে তখনও মৃত্যুর প্রহর গুনছে। মৃত্যুর গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আসছে। দুর্যোগস্থলে আটকে পড়া মানুষের হাজারো পরিবারের ভিড়। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে উদ্ধারকাজ দুই পর্বে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম পর্বে খালি হাতে উদ্ধারকাজ ও দ্বিতীয় পর্বে যান্ত্রিক উদ্ধারকাজ। দুর্ঘটনাস্থলে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়, যা সম্পূর্ণ উদ্ধার অভিযানে ২৪ ঘণ্টা খোলা ছিল। সরকারি-বেসরকারি উদ্ধারকর্মীদের সমন্বিতভাবে উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সদর দপ্তর এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। একনাগাড়ে ২৪ দিন উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়। এ উদ্ধার অভিযানে সেনা

কর্তৃপক্ষ তার লোকবল ও যন্ত্রপাতিসহকারে উপস্থিত সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিশেষ করে ৯ পদাতিক ডিভিশন এ উদ্ধার অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ৯ পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্বে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন এজেন্সি ও স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উদ্ধার অভিযান সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়। দুর্ঘটনাস্থলের ভয়াবহতা প্রকাশে কিছু চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো :

রানা প্লাজার অবস্থান | রানা প্লাজার ভবন ধস

দুর্ঘটনাস্থলের পার্শ্বচিত্র

ধসে পড়া ভবনের পার্শ্বচিত্র

দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- **হতাহতের বিবরণ**
  - সর্বমোট জীবিত উদ্ধার - ২৪৩৮ জন
  - হাসপাতালে মৃতের সংখ্যা - ১৭ জন

- অবশিষ্ট জীবিত উদ্ধার - ২৪২১ জন
- ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত মরদেহ - ১১১৫ জন
- হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ গ্রহণ - ১৭ জন
- সর্বমোট উদ্ধার (২৪২১+১১৩২) - ৩৫৫৩ জন

● **অন্যান্য বিবরণ**

- নিখোঁজ - ২৬১ জন
- অজ্ঞাত হিসেবে মৃতদেহ দাফন - ২৯১ জন
- বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি - ২২ জন
- স্থায়ীভাবে অক্ষম রোগী - ৪৬ জন
- অঙ্গচ্ছেদ রোগী - ২৫ জন
- দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা চাহিদার রোগী - ১৫০ জন
- দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা প্রয়োজন এমন রোগী - ২২১ জন

উদ্ধার অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়োজিত জনবল ও সরঞ্জামাদির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ক্রমিক	সেনাবাহিনীর ফরমেশন	জনবল	সামগ্রী	মন্তব্য
১।	৯ পদাতিক ডিভিশন	৩৯৯৭	১xখননকারী যন্ত্র, ১xফর্কলিফটার, ১xক্রেন, ৩xডাম্পার, ১xডোজার, ১xলোডার, ১xলাইট টাওয়ার, ৪xঅ্যাম্বুলেন্স, ১xজেনারেটর, ১xকংক্রিট কাটার, ৩xরড কাটার।	
২।	১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জি. ব্রিগেড	৬০৫	১xপারসোনাল লোকেশন সিস্টেম, ১xশ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, ১xহাইড্রোলিক যন্ত্র, ৪xজেনারেটর, ৭xকাটার, ৩xচলমান লাইট টাওয়ার, ১০xশাবল, ৯xকম্পক, ৫xস্প্রেডার, ৮xহ্যামার, ২xহুইল ডোজার, ২xট্রান্সপোর্ট, ২xখননকারী যন্ত্র, ৮xএয়ার লিফটিং ব্যাগ, ১xএয়ার কমপ্রেসার, ২xচেইন, ২xগ্রাইন্ডিং মেশিন, ২xগ্যাস কাটার।	
৩।	১৮ ইঞ্জি. ব্যাটালিয়ন	৫৮	১০xগ্যাস কাটার, ৫xকংক্রিট ব্রেকার, ৪xরিচার্জেবল সার্চলাইট, ২xজেনারেটর, ১xহাইড্রোলিক জ্যাক এবং অন্যান্য কাটার যন্ত্র।	
৪।	এসডব্লিউও (পশ্চিম)	১৯৩	১০xহিট টি ও বোচ, ৬০০xহেলমেট, ৪০০xগ্লোভস, ৩০xটর্চ, ৩৫xমাস্ক।	
৫।	লজিস্টিক এরিয়া	৩১		
৬।	৪৬ স্বতন্ত্র পদা. ব্রিগেড	১১		
সর্বমোট	সেনাবাহিনী	৪৮৯৫		

নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ভাঙা বোল্ডারের অসহ্য আঘাত প্রতিহত করে শত শত উদ্ধারকর্মী রানা প্লাজার ধ্বংসাবশেষ হতে আটকে পড়া অসহায় মানুষকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। স্বেচ্ছাসেবীরাই দুর্ঘটনাস্থলে প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন।

উদ্ধারকাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও এই স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের প্রচলিত-অপ্রচলিত ও উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে এ বিশাল ধ্বংসস্তূপ থেকে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সব দুর্বলতা ছাপিয়ে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, আগ্রহ, সহমর্মিতা তথা মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাই উদ্ধারকাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যার ফলে তাঁরা নিজের জীবন বিপন্ন করেও অন্যের জীবন বাঁচানোর মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু আহত ব্যক্তি, যাঁদের দুর্ঘটনার প্রথম দিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁরাও প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েই উদ্ধার অভিযান ঝাঁপিয়ে পড়েন।

উদ্ধার অভিযানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

নেপোলিয়ন হিল যথার্থই বলেছেন, 'During times of disaster sorrow brings people together in a spirit of friendship, and influences man to recognise the blessings of becoming his brother's keeper.' অভিযানের প্রথম থেকেই দুই সহস্রাধিক সৈনিক দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধারে ও ভাঙা ইটের টুকরা অপসারণে নিয়োজিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে উদ্ধার অভিযানের গতি বৃদ্ধি পায় যখন ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, রেড ক্রিসেন্ট, বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ জনগণ সেনাবাহিনীর উদ্ধার দলের সঙ্গে উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অতীব জরুরি প্রয়োজনের সময় প্রায় ২০টি বেসরকারি সংগঠন জরুরি ত্রাণ, চিকিৎসা, অক্সিজেন, লাইট এবং ভারী উদ্ধারকাজের যন্ত্রপাতিসহকারে এগিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে উদ্ধারকাজে এসব সংগঠনের অবদান ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। বিশেষ ধরনের ধসের কারণে (প্যানকেক টাইপ) ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া শত শত লোককে উদ্ধারের জন্য কোনো পার্শ্ব থেকেই দুমড়ে যাওয়া রানা প্লাজার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ জন্য উদ্ধারকারী দল মেঝেতে ও পার্শ্ববর্তী আরএস টাওয়ারের দেয়াল ছিদ্র করে ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। প্রথম দিকে এটা হাতের সাহায্যে করা হলেও কাজের ধীরগতির কারণে কিছু সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর যন্ত্র, যেমন– রডকাটার, ওয়ালকাটার, হাতুড়ি ইত্যাদির প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। বাস্তবে ওই যন্ত্রগুলো উদ্ধারকর্মীদের কাছে থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। অবশেষে বিষয়টি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো এবং উপস্থিত সকলে যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে হাজির হন। এসব যন্ত্রপাতির বেশির ভাগই ছিল স্ব-উদ্ভাবিত কাটিং ও ডিগিং টুলস।

বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের অভিজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে প্রথম দিকে সম্পূর্ণ উদ্ধার অভিযান খালি হাতে পরিচালনা করতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'যদি উদ্ধার অভিযানে ভাঙা সিলিং সরাতে ক্রেন ও ভারী সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধার করার সম্ভাবনা কমে আসবে।' এ জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তখন পর্যন্ত যেসব জীবিত ব্যক্তিকে উদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে চাননি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলেও এটা পরিষ্কার ছিল যে, একজন জীবিত লোক উদ্ধারের সুযোগ থাকলেও খালি হাতে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হবে। উদ্ধারকাজের কিছু চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো :

সম্মিলিত উদ্ধার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিতকরণ

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের ছাদ ছিদ্র করে একজন স্বেচ্ছাসেবক রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মৃতদেহ বের করে নিয়ে আসছেন

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কক্ষ উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক, সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসহ সবার কার্যক্রমের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথম দিকে উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একই মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে একসঙ্গে কাজ করেছে।

উদ্ধারকারী দল খালি হাতে উদ্ধার ও যান্ত্রিক উদ্ধার উভয় কাজই সমানভাবে সমন্বয় করে। যেহেতু উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক জীবিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা, তাই ম্যানুয়াল ও যান্ত্রিক উদ্ধার দুটোই একসঙ্গে না চালিয়ে একটির পর একটি পরিচালনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সংগঠন ও সব পক্ষ তাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বাত্মক সহায়তার জন্য আকুণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার। আরও প্রশংসার দাবি রাখে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির সাধারণ জনগণ, যারা স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে হাতের কাছে যা কিছু ছিল তা নিয়েই উদ্ধার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের ছাদ ছিদ্র করে একজন স্বেচ্ছাসেবক রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মৃতদেহ বের করে নিয়ে আসছেন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারে সিলভিয়া মেথিউস ব্রুয়েল বলেন, 'While natural disasters capture headlines and national attention short-term, the work of recovery and rebuilding is long-term.' তার পরও উদ্ধারকাজ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন করার পরও সশস্ত্র বাহিনীর কাজ এখানেই শেষ নয়। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ অনেক আশায় বসে থাকে এর প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু পেতে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদা পূরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় :

- উদ্ধারকৃত, অক্ষম, হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সঠিক প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ।
- পুনর্বাসন ব্যবস্থায় সর্বাত্মক সাহায্য।
- অনুদানের টাকা প্রদান ত্বরান্বিত করা।

রানা প্লাজার ঘটনায় প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় প্রচারমাধ্যমের শক্তিশালী ভূমিকার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি উত্তরণে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। এ ঘটনায় সেনাবাহিনী ও প্রচারমাধ্যমের সম্পর্ক ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ হয়ে কাজ করবে, যেখানে উভয়ে পাশাপাশি থেকে নিজস্ব দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করবে। সেনাবাহিনী ও প্রচারমাধ্যমের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সেনাবাহিনীকে তার দায়িত্ব পালনে ভীষণভাবে সহায়তা করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রচারমাধ্যম অন্যতম একটি ভূমিকা পালন করে, যা মূলত প্রচারমাধ্যম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিতদের মাঝে কেমন সম্পর্ক, তার ওপর নির্ভর করে। যদি এ সম্পর্ক ভালো হয়, তাহলে উভয়ই উপকৃত হতে পারে। দুর্যোগের সময় মিডিয়া উপস্থিত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর প্রতিটি মুহূর্তের তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেনাবাহিনীর ৯ পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়কারী সেল প্রতিনিয়ত একজন দক্ষ অফিসারের মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্তের ব্রিফিং দিয়েছে। মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন সংস্থা ও হাসপাতাল উদ্বুদ্ধ করেছে উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসাকাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে। এই উদ্ধারকাজে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক অংশগ্রহণ করেছে। ঘটনাস্থলের কাছেই এনাম মেডিকেল কলেজ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছে, তা অন্যান্য মেডিকেল সংস্থার জন্য একটি উদাহরণস্বরূপ। দুর্যোগ উত্তরণে জাতিকে একীভূত করার জন্য মিডিয়া দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার অভিযান সরাসরি সম্প্রচার করে। ভবিষ্যতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মিডিয়া রানা প্লাজা ধসের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার ব্যবস্থা করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অন্যান্য দেশের উদাহরণ

চীন প্রায়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের ভালো মানের যন্ত্রপাতি ও 'কুইক রেসপন্স ফোর্স' রয়েছে। তদুপরি ২০০৮ সালে 'ওয়েন চুয়েন' ভূমিকম্প তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যথেষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ জনবল থাকা সত্ত্বেও তারা দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা আনুমানিক ৭০,০০০ পার হয়ে যায়।

২০১৪ সালে ভারতের চেন্নাই ভবন ধসের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি উদাহরণ। ১১ তলা ভবন ধসের ঘটনায় অন্ততপক্ষে ৬২ জন প্রাণ হারান এবং বহু লোক আহত হন। ভারত সরকার আধুনিক রিকভারি যন্ত্রের সাহায্যে বিপদ কাটিয়ে ওঠে। এর সঙ্গে তুলনা করলে সীমিত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বাংলাদেশ রানা প্লাজা ধসের উদ্ধারকাজে যথেষ্ট পরিপক্কতার পরিচয় দেয়। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে এ দেশের কৃতী সন্তানদের আত্মোৎসর্গিক মনোভাব, কঠিন পরিশ্রম ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কারণে।

উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় বাধা ও সীমাবদ্ধতা

রানা প্লাজা উদ্ধার অভিযানের বাধা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপ :

- এ ধরনের উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবলের

স্বল্পতা (বিশেষত কাঠামোগত ধসের উদ্ধার অভিযানের প্রশিক্ষণ)।

- পর্যাপ্ত উদ্ধার যন্ত্রপাতির অভাব (হালকা ও ভারী)।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত কঠিন ছিল।
- উদ্ধার যন্ত্রপাতির স্বল্পতা উদ্ধার অভিযানের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।
- যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

কিছু লক্ষণীয় বিষয়

পোশাক শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ। উদ্ধার অভিযানে প্রধানত যে বিষয়টি প্রকট হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে দুর্ঘটনাকালে রানা প্লাজায় কর্মরত শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ। বিজিএমইএ থেকে রানা প্লাজায় কর্মরত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা না পাওয়ায় ঠিক কতজন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন, তা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তা ছাড়া কর্মরত শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা পাওয়ার চেষ্টায় উদ্ধার অভিযানের নানা ধাপে বিভিন্ন অফিসের কম্পিউটারে শ্রমিকদের তালিকা খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এটা আন্তরিকভাবে অনুভূত হয়েছে যে, বিজিএমইএ কর্তৃক একটি ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক স্থাপন করা উচিত, যাতে যে কেউ যেকোনো সময় জানতে পারেন কোন পোশাক কারখানায় ওই মুহূর্তে ঠিক কতজন শ্রমিক কর্মরত আছেন। এর ফলে ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক উদ্ধার অভিযানে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারবে এবং পোশাকশিল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয়টি হচ্ছে, যারা দেশের আর্থিক উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, সেই পোশাক শ্রমিকদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার অভাব। তাঁদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হলে তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। পোশাকশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ, যেমন– মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা, বিজিএমইএ এবং সরকারকে পোশাকশিল্পের সব সমস্যার সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

রিচার্ড ব্যাজ বলেন, 'There's no disaster that can't become a blessing, and no blessing that can't become a disaster.' দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা দূরীকরণে রানা প্লাজা উদ্ধার অভিযান থেকে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভের সুযোগ নিতে পারি। অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্য থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলো :

● বড় পরিসরে উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

● এ ধরনের উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য যথাযথ যন্ত্রপাতি থাকা প্রয়োজন (ভারী ও হালকা)।

● প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্য হাতের ব্যবহার উপযোগী কিছু যন্ত্রের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং তালিকা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক উদ্ধারকারী দলের কাছে তা জোগান দেওয়া।

● কাঠামোগত ধসের (Stuctural Collapse) উদ্ধার অভিযান দুর্যোগ মোকাবিলার এসওপির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন প্রয়োজন।

● সকল বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে জরিপ চালানো এবং প্রয়োজনে সংস্কার করা উচিত।

● আবাসিক এলাকায় পোশাক কারখানা এবং বাণিজ্যিক ভবন তৈরির অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

● এ ধরনের উদ্ধার অভিযান, যেখানে সরকারি-বেসরকারি অনেক সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে, সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

● স্বেচ্ছাসেবকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

● এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা উচিত।

উপসংহার

যেকোনো জাতীয় দুর্যোগে, দল-মত নির্বিশেষ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করে, যা আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। কোনো প্রকার পরিচয় ব্যতিরেকে সামরিক-বেসামরিক, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ জনগণ সকলেই জীবন রক্ষার একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামরিক ও বেসামরিক সহযোগিতায় এর চেয়ে ভালো নিদর্শন আর কী হতে পারে? এটি একটি জাতির জন্য মহান শিক্ষা, অর্জনও বটে। ধূলিসাৎ একটি ভবন থেকে ২,৪৩৮ জন মানুষকে জীবিত উদ্ধার একটি বিরল ও অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেবে।

এই উদ্ধার অভিযানে সেনাবাহিনী, ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, রেড ক্রিসেন্টসহ অন্যান্য বেসামরিক সংস্থা একযোগে অংশগ্রহণ করে। উদ্ধার তৎপরতায় এসব সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। উদ্ধারকাজের সব পর্যায়ে বুয়েটের তত্ত্বাবধানে উদ্ভাবিত উপায় ব্যবহার করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষকেও জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ছোট ছোট মেশিন দ্বারা নিজ হাতে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ৯ পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয় কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে উদ্ধারকাজকে সমন্বয় করেছে।

এ অভিযান পরিচালনায় সকলেরই বিবিধ সীমাবদ্ধতা ছিল। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও

সরঞ্জামের অপ্রতুলতা তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব নীতিনির্ধারক ও কর্ণধারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল এ অভিযানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। উদ্ধারকারীদের মধ্যে সমন্বয় ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও কর্তৃপক্ষের কার্যবিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছে। একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাকরণ, বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের জরিপ, এতদবিষয় সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ এবং যৌথ অনুশীলন ভবিষ্যতের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে।

সুপারিশসমূহ

ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে :

- সব পক্ষের সমন্বয়ে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং সুবিধাজনক আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

- দুর্যোগকালে কার্যকর ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে স্বাভাবিক সময়ে আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুশীলন করা।

- বিজিএমইএ কর্তৃক ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক স্থাপন করা, যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন পোশাক কারখানায় কতজন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন, তা জানা যায়।

- প্রণীত বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ করা, যাতে ত্রুটিযুক্ত নকশার কোনো ভবন তৈরি না হয়। শিল্প-কারখানার জন্য নির্দেশিত কাঠামোগত নকশা অনুসরণ করে ভবন তৈরি করা উচিত। নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করার জন্য বাংলাদেশের সব পোশাক কারখানা ভবনে জরুরি ভিত্তিতে জরিপ চালানো উচিত।

- আবাসিক এলাকায় পোশাক কারখানার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোশাক কারখানা জরুরি ভিত্তিতে শিল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর করা উচিত।

- রাজউক/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক ভবন নির্মাণে যথাযথ আইন মানা হচ্ছে কি না, তা তদারক করা উচিত। ভবন যথাযথ পরিদর্শনের পরেই কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত।

- যথেষ্ট ও যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সকল স্তরের ও পর্যায়ের সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে নিয়মিত যৌথ অনুশীলনের আয়োজন করতে হবে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফোর্সের জনবল বৃদ্ধি ও যথাযথ উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যাবে।

তথ্যসূত্র

প্রেজেন্টেশন

১। ০৮ মে ২০১৩, ৯ পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক উচ্চপদস্থ বৈদেশিক কর্মকর্তাদের প্রদত্ত উপস্থাপনা 'Rana Plaza Rescue Operation.'

২। মো. ইমতিয়াজ কবির কর্তৃক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এমবিএ গ্র্যাজুয়েটদের প্রদত্ত উপস্থাপনা 'Who to be blamed for the miseries of the Garments workers in Bangladesh?'

আর্টিকেলস

৩। হিশাম বিন মোস্তফা কর্তৃক রচিত ইংরেজি প্রবন্ধ 'Brief History of the Rana Plaza Tragedy.'

৪। উইকিপিডিয়া হতে সংগৃহীত '2013 Savar Building Collapse'

৫। ইনাম আহমেদ কর্তৃক রচিত ইংরেজি প্রবন্ধ 'Rana Plaza will remind us how a nation united at a crucial time to help humanity'

ওয়েবসাইট

৬। www.thedailystar.net/rana-plaza

৭। www.en.wikipedia.org/wiki/2013-savar-building-collapse

৮। www.brainyquote.com/quotes/..../natural-disasters, html

লে. কর্নেল মোহা. আমিরুল ইসলাম, পিএসসি, আর্টিলারি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি আর্টিলারি রেজিমেন্টে বিভিন্ন নিযুক্তিতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের গ্র্যাজুয়েট এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স অব ডিফেন্স স্টাডিজ সম্পন্ন করেন। তিনি ২৬ ফিল্ড রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক এবং ১১ এসপি রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে কর্তব্য পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সহকারী সামরিক সচিব হিসেবে সেনাসদর, সামরিক সচিবের শাখায় কর্মরত আছেন।

সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সমুদ্রজয়

লে. কর্নেল কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত বন্ধুসুলভ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের দরবারে একটি শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই নীতি অনুসরণ করে একই সময়ে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে জল ও স্থল বহিঃসীমানা সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনের জন্য বলিষ্ঠ কূটনৈতিক সংযোগ, প্রয়োজনীয় লবিং ও দ্বিপক্ষীয় প্রচেষ্টার সূচনা করে। তবে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল ধারাবাহিকতার ঘাটতি থাকায় ১৯৭১-পরবর্তী ৪০ বছর ধরে জলসীমানা নির্ধারণের বিষয়টি অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে (২০০০, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিচক্ষণ, সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ৭ জুলাই ২০১৪ সালে ভারত ও ১৫ মার্চ ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য উভয় দেশের সঙ্গেই আমাদের প্রাপ্য বিজয় অর্জিত হয়েছে। সে সঙ্গে দেশের জন্য উন্মোচিত হয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এই বিজয় নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে উভয় রায়ই বিশ্বের দরবারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বিপক্ষীয় বিরোধ মীমাংসার এক উত্তম ও অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে শত শত বছর উচ্চারিত হবে বলে আমরা নিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র-সংক্রান্ত সব বিষয় ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি (UNCLOS)-এর ধারা অনুযায়ী মীমাংসিত ও পরিচালিত হয়। এ আইন মেনে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সর্বজনস্বীকৃত দুটি আদালত রয়েছে। এর একটি জার্মানিতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অব দ্য সি (ইটলস) এবং অন্যটি হল্যান্ডের দ্য হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)। আনক্লজ-এর আর্টিকেল ২৮৭ এবং ক্রোড়পত্র ০৭, ১৯৮২ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৮ নভেম্বর মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কাজ শুরু করে এবং একই বছর ১৩ ডিসেম্বর উভয় দেশ ITLOS-এর বিচারকার্য মেনে নিতে সম্মতি জানায়। অতঃপর প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, উপযুক্ত আদালত নির্বাচন ও আইনজীবী নিয়োগ, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও সর্বোপরি শক্তিশালী লবিং, কূটনৈতিক দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখে ২০১২ সালে ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায়ে মিয়ানমারের বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ী হয়। একইভাবে ২০১৪ সালে দ্য হেগের সালিশি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের মামলায় প্রদত্ত রায়ও মূলত বাংলাদেশের পক্ষেই যায়। যার ফলে চার দশকের বেশি সময় ধরে বিরাজমান সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ঘটে এবং সমুদ্র হতে সম্পদ আহরণের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও দূর হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক আদালতে পাওয়া সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত রায়ে মূলত আমাদেরই বিজয় হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ মানুষের চোখে যেমনি, তেমনি সমুদ্র বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণেও একইভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কেননা, এই রায়ের মাধ্যমে আমাদের দাবীকৃত সুবিশাল এলাকার প্রায় পুরোটাই আমরা পেয়েছি এবং যুদ্ধকালীন সম্ভাব্য সমুদ্রপথে আবদ্ধ (সি-লকড্) অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছি। এর ফলে আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে। এ ছাড়া রায়ের পর এখন বিরোধপূর্ণ কোনো অঞ্চলের অস্তিত্ব না থাকায় এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্ভব হবে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এসবের পাশাপাশি বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে কৌশলে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যেতে পারাটাও ছিল আমাদের জন্য এক অসামান্য কূটনৈতিক সাফল্য। এ অর্জন শুধু সরকারের নয়, বরং রাষ্ট্র হিসেবে পুরো বাংলাদেশের। তাই এ সম্বন্ধে সব সচেতন নাগরিকের মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরল ভাষায় বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় সম্বন্ধে সবাইকে ধারণা দেওয়াই এ লেখার উদ্দেশ্য। তবে লেখার পরিধি সীমিত রাখার জন্য এখানে সমুদ্রজয় থেকে সৃষ্ট সম্ভাবনাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে না, বরং সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকে কেন আমরা আমাদের বিজয় বলছি, কেবল সে বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

সমুদ্র অঞ্চল নিয়ে চলা দীর্ঘ বিরোধের উপযুক্ত সমাপ্তি

১৯৭৪ সালের পর থেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বর্তমান সমুদ্র অঞ্চলের প্রায় পুরোটিই ছিল বিরোধপূর্ণ। ২০০৭ সালে বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমানার ভেতরে মিয়ানমারের গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা তারও বহু আগে ১৯৭৪ সালে ভারতের সমুদ্রসীমানা সংলগ্ন বাংলাদেশি সমুদ্র ব্লকে বাংলাদেশ কর্তৃক নিয়োজিত মার্কিন তেল কোম্পানিকে ভারতের বাধা ও কাজ করতে না দেওয়ার ঘটনাগুলো এই বিরোধের দুই একটি বড় উদাহরণ মাত্র। তিনটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুসুলভ হলেও অমীমাংসিত সমুদ্রসীমানা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থে উপরোক্ত নেতিবাচক মনোভাব লালন ও তার বহিঃপ্রকাশ যে ভবিষ্যতেও ঘটত, তা বলা বাহুল্য। এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, এ বিরোধ দিন দিন আরও বড় হয়ে দেখা দিত। কেননা, সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে উন্মোচিত বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও তেলসম্পদ সবার কাছে এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেই যে সর্বদা ভুক্তভোগী হতে হতো, এটাও অনেকাংশে নিশ্চিত। তবে স্বস্তির কথা হলো, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে এই বিশাল সমুদ্র অঞ্চল এখন বিরোধমুক্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে চলমান বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করতে পারাটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বড় একটি বিজয়।

বাংলাদেশের উপকূল ফানেলাকৃতির

এ ক্ষেত্রে সমতানীতি অনুসরণ করাই যথার্থ

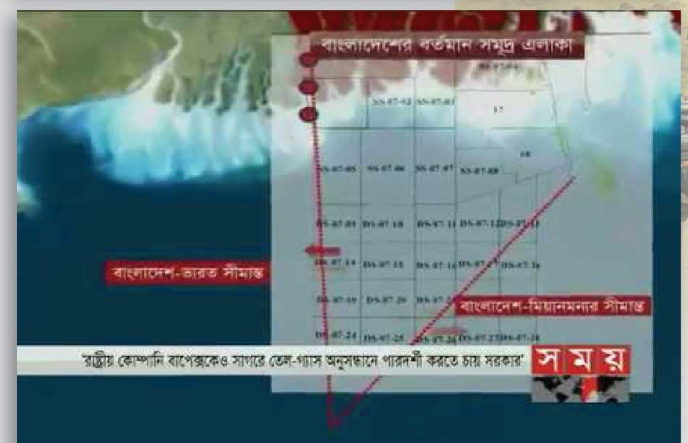

আদালতের রায়ে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকাপ্রাপ্তি

বাংলাদেশের ন্যায্যতার দাবি প্রতিষ্ঠা

আন্তর্জাতিক আদালতে প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ন্যায্যতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিয়ানমার ও ভারত আদালতের কাছে সমদূরত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে বিষয়টি মীমাংসা করার

জন্য আবেদন করে। অথচ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে বেঁকে গিয়ে ফানেল আকৃতি ধারণ করার কারণে সমদূরত্ব পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশ একটি সমুদ্রপথে আবদ্ধ দেশে পরিণত হতো। তাই ন্যায্যভাবেই সমতানীতি অনুসরণ করার দাবি ছিল বাংলাদেশের। আর আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আদালত কর্তৃক সমতানীতি অনুসরণের কারণে আমরা আমাদের ন্যায্য পরিমাণ সমুদ্র অঞ্চল লাভ করতে পেরেছি।

বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপরীতে কৌশলী জবাব

যেকোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে সাধারণত বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বড়ত্বের অহমের কারণে ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান দ্বিপক্ষীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হতে চায় না। কেননা, এরূপ পরিস্থিতিতে বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক প্রভাব/আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অথচ এ ক্ষেত্রে ভারত ও মিয়ানমারের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হয়েও কৌশলে তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন এবং নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সম্ভাব্য সমুদ্রপথে আবদ্ধ (সি-লকড্) অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া

ভৌগোলিক অবস্থান ও আকৃতির কারণে বাংলাদেশ এমন একটি অবস্থায় রয়েছে, যেখানে সমদূরত্ব নীতি অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমায় একটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ বা সি-লকড্ দেশে পরিণত হতো। ফলে বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল দিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেত। বর্তমান রায়ের কারণে সম্ভাব্য সি-লকড্ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সরবরাহ পথ বা বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থাৎ সি লাইন অব কমিউনিকেশন (SLOC) নিশ্চিত হলো। অথচ ভারত ও মিয়ানমারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে যুদ্ধকালীন সমুদ্রপথে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং এর প্রভাবে সার্বিক অর্থনীতি অদৃষ্টের কাছে বাধা পড়ত ও রসদ সরবরাহ মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখি হতো।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হওয়া

আদালত প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশ কর্তৃক বর্ধিত সমুদ্রসীমা প্রাপ্তির ফলে নিজস্ব জলসীমানায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত– উভয় ধরনের হুমকি মোকাবিলা করা সহজ হবে এবং

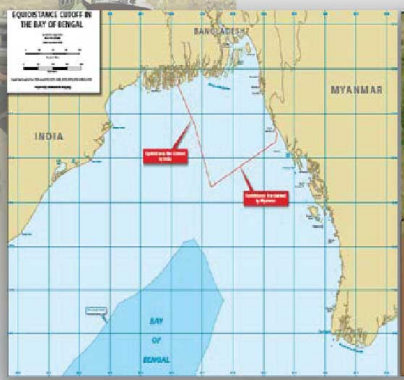

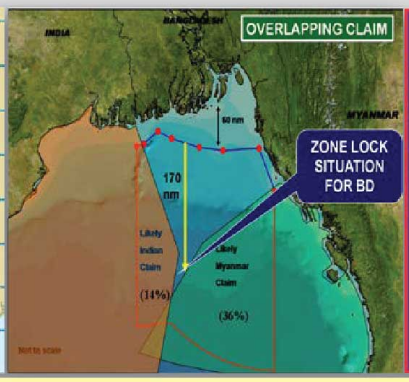

ভারত ও মিয়ানমার কর্তৃক দাবীকৃত সমুদ্রসীমা অনুযায়ী বাংলাদেশ সমুদ্র এলাকায় আবদ্ধ হয়ে পড়ত

আদালতের রায়ে বাংলাদেশ সম্ভাব্য সি-লকড্ অবস্থা হতে মুক্ত হয়েছে

এর ফলে সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হবে। কেননা, এর ফলে সমুদ্রপথে ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, চোরাচালান রোধ, জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ এবং সমুদ্রপথে অননুমোদিত সব ধরনের মালামাল ও জনবল অনুপ্রবেশ এবং বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত জলসীমায় সব ধরনের প্রতিরক্ষা প্রদান এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের। বিগত দিনে সমুদ্রের বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে যেকোনো ধরনের মানব পাচার, মাদক চোরাচালান, জলদস্যুতা, খনিজ সম্পদ খনন, অবৈধ মৎস্য আহরণ ইত্যাদি রোধকল্পে এই বাহিনীদ্বয় কর্তৃক অপারেশন পরিচালনা করার সময় ক্ষেত্রবিশেষে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি হতো। এখন থেকে আমাদের প্রাপ্ত জলসীমানায় আমরা উল্লেখিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নির্বিঘ্নে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সব ধরনের অভিযান পরিচালনা করতে সমর্থ হবো।

এ ছাড়া সুবিশাল জলসীমা অর্জন করায় ভবিষ্যতে এই নিজস্ব সমুদ্র অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই আমাদের নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের আধুনিকায়ন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক ডুবোজাহাজ, যুদ্ধজাহাজ, তল্লাশি বিমান ও জলযান অন্তর্ভুক্তকরণ, তল্লাশি ও উদ্ধার ইউনিট গঠন এবং নৌবাহিনীর সার্বিক জনবল ও রণকৌশলগত নীতির নিশ্চিত আধুনিকায়ন ঘটবে। এতে সার্বিকভাবে বঙ্গোপসাগরের জলসীমানায় ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের বহিঃশত্রুর আক্রমণ বাংলাদেশ আরও সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। এমনকি শান্তিকালীন সময়েও নিজস্ব সমুদ্রসীমা পাহারা দেওয়া ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিশ্ব ইতিহাসে বিরল কূটনৈতিক সাফল্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন

পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি যেসব দেশ বাংলাদেশের ন্যায় অনুরূপ জলসীমানার বিরোধ নিষ্পন্নের চেষ্টা করেছে, তারা আমাদের মতো প্রতিটি দাবির ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেনি। এমনকি ন্যায্যতার ভিত্তিতে আদালতের রায় দেওয়ার ঘটনাও বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। উল্লেখ্য, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত হওয়ায় ১৯৬৭ সালে জার্মানি আন্তর্জাতিক আদালতে অনুরূপ সি-লকড অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দাবি জানায় এবং আদালতের রায়ে জয়ী হয়। জার্মানি যে আদালত থেকে তাদের পক্ষে রায় পেয়েছিল, বাংলাদেশও দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে সেই একই আদালতের শরণাপন্ন হয়। এ ছাড়া গিনি, গিনি বিসাউ, কানাডা, মোনাকো ও ব্রুনেই নানা সময়ে সমতানীতির ভিত্তিতে সমুদ্র অঞ্চল প্রাপ্ত হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রেই সমুদ্র অঞ্চলের পরিমাণ বিবেচনায় এই প্রাপ্তি ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়; আদালতের রায়ে

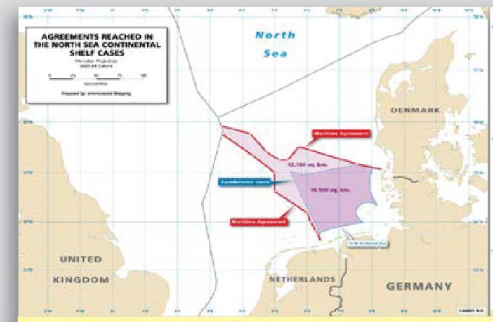

নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের কাছ থেকে মাত্র ১২,১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পেয়েছে জার্মানি

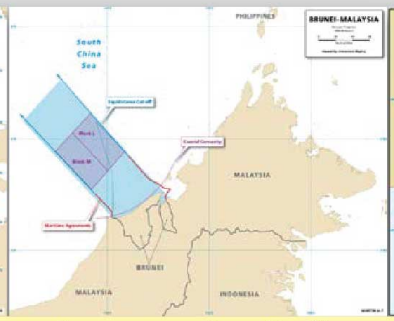

মালয়েশিয়ার কাছ থেকে ব্রুনেইয়ের প্রাপ্তিও অতি সামান্য

ফ্রান্সের কাছ থেকে মোনাকোর প্রাপ্তি অতি নগণ্য

আমরা পেয়েছি বিশাল সমুদ্র এলাকা। অধিকন্তু গত ৪০ বছরের এই অমীমাংসিত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করতে পারাটাও বাংলাদেশ সরকারের এক বিরল কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবেই পরিগণিত হবে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে আদালতে নিজেদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন

১২ জুলাই ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকার UNCLOS বিলটিতে অনুস্বাক্ষর করে। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের দাবি উপস্থাপন করার জন্য এই আইনে সরকারের অনুস্বাক্ষর করাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। আর এই বর্ধিত সমুদ্র এলাকা পেতে চাইলে অনুস্বাক্ষরের ১০ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক তথ্য-উপাত্তসহ জাতিসংঘের কাছে দাবি উপস্থাপন করতে হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশের জন্য দাবি উপস্থাপনের শেষ সময় ছিল ২০১১ সালের ২৬ আগস্ট। এ ছাড়া বিশেষ দুটি জরিপ ছাড়া এই দাবি উপস্থাপন করাও সম্ভব ছিল না।

এই বাস্তবতায় সরকার কর্তৃক সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞ রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খোরশেদ আলমকে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনক্লজ অনু বিভাগে বিশেষ নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ পাওয়ার পরপরই তিনি সমুদ্র জরিপ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে কোনো জরিপ জাহাজ ছিল না। এমতাবস্থায় তৎকালীন সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দ্রুত একটি জরিপ জাহাজ কেনার অনুমতি প্রদান করে এবং ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে জাহাজটি বাংলাদেশে আসে। এর পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাত্র ২৫ কোটি টাকা দিয়ে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার জরিপ সম্পন্ন করা হয়, যদিও এ জন্য সরকার প্রদত্ত বাজেট ছিল ৮০ কোটি টাকা। এর ফলে আমাদের পক্ষে আরও ১০০ কিলোমিটার বেশি সমুদ্র এলাকা দাবি করার সুযোগ তৈরি হয়। অবশেষে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পক্ষে ৩৮০ থেকে ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৫০ মাইলের বেশি মহীসোপানের দাবি উপস্থাপন করা হয়। ২০১০ সালে যদি দ্রুততার সঙ্গে জরিপ জাহাজ ক্রয় ও প্রয়োজনীয় জরিপ সম্পন্ন করা না যেত, তাহলে আমাদের আজকের এই অর্জন কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকা লাভ করায় সমুদ্রতত্ত্ব, জলবায়ু ও উপকূল এলাকার ওপর কার্যকরী গবেষণা এবং এ এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সহজতর হবে। এর ফলে সমুদ্র থেকে সৃষ্ট যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন– ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সুনামিসহ মৌসুমি অতি ও অনাবৃষ্টির পূর্বাভাস এবং উপকূলীয় ভাঙন ও সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য অনেক সহজে ও আগেভাগেই পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক ও প্রস্তুত হওয়ার জন্য আমরা পূর্বের থেকে আরও বেশি সময় পাব এবং এতে করে আমাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতাও আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া SPARRSO (Space Research and Remote Sensing Organisation)-এর কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যাওয়ায় বাংলাদেশের

জন্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, নিয়মানুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পর প্রথম পাঁচ বছরে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সি বেড অথরিটিকে (আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষ) কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। তাই বাংলাদেশকে দ্রুত সাগরের সম্পদ আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে। অবশ্য এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরের নিজস্ব এলাকায় দেশের চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থাৎ উপকূল থেকে ৩৫৪ মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশের সম্পদ আহরণের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের মহীসোপান সীমা নির্ধারক কমিশনে (CLCS) সরকার দাবি পেশ করেছে।

সুবিশাল সমুদ্র এলাকা অর্জন

বাংলাদেশ তার দাবি অনুযায়ী আদালতের কাছ থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র সাগর এলাকা (টেরিটোরিয়াল সি) লাভ করেছে। এমনকি সেন্টমার্টিন দ্বীপের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। অধিকন্তু ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সীমানায় নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে ২০০ নটিক্যাল মাইল বা এক লাখ সাত হাজার বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা দাবি করে এক লাখ ১১ হাজার বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা পেয়েছে, যা দাবীকৃত এলাকার চেয়েও বেশি। এর পাশাপাশি ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আমাদের ভাগে বর্ধিত মহীসোপানের কথাও এই রায়ে বলা হয়েছে। একইভাবে ভারতের সঙ্গেও আমরা দাবীকৃত ২৫ হাজারের মধ্যে ১৯ হাজার বর্গমাইল এলাকা পেয়েছি।

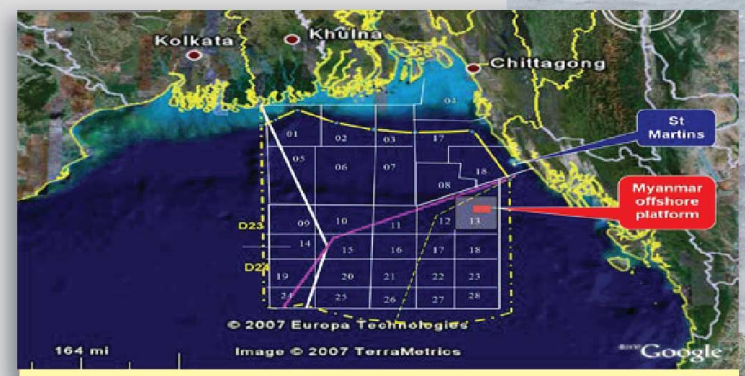

আদালতের রায়ে বাংলাদেশ প্রায় সব বিরোধপূর্ণ তেল-গ্যাস ব্লকের মালিকানা লাভ করেছে

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ তার সমুদ্রবক্ষে আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস অনুসন্ধানী কোম্পানিগুলোকে অনুসন্ধান চালাতে আগ্রহী করতে পারেনি। বারবার আমন্ত্রণ জানিয়েও এসব কোম্পানিকে এ দেশে আনতে না পারাটা ছিল দুর্ভাবনার বিষয়। এর কয়েকটি কারণের মধ্যে প্রধানতম একটি হলো, বাংলাদেশের গ্যাস ব্লকগুলো নিষ্কণ্টক ছিল না। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানার পূর্ব অংশে সব ব্লকের ওপর মিয়ানমারের দাবি ও পশ্চিম দিকে ভারত সীমান্তবর্তী সব ব্লকে ভারতের দাবি এসব আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাছে ব্লকগুলোকে বিতর্কিত ও বিনিয়োগে ঝুঁকিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাই বাংলাদেশের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা ছিল অত্যাবশ্যকীয়, যতটা না ছিল প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের জন্য। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে এখন বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকল না।

বর্তমানে গভীর সাগরে ও উপকূলে বাংলাদেশের মোট ২৮টি তেল-গ্যাসের ব্লক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখান থেকে সঠিকভাবে গ্যাস উত্তোলন করা হলে মোট গ্যাসপ্রাপ্তি ৫০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য খনিজ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ব্যাপারে সরকার নতুন উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট বা পিএসসি)

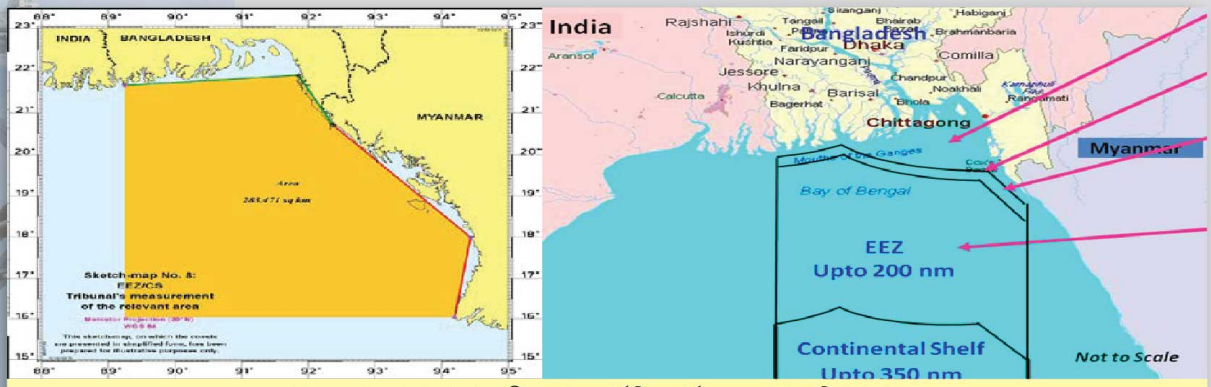

আদালতের রায়ে বাংলাদেশ তার দাবীকৃত প্রায় সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার মালিকানা লাভ করেছে

প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। শিগগিরই বঙ্গোপসাগরে গভীর ও অগভীর ব্লকগুলোতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে পঞ্চম দফায় টেন্ডার আহ্বান করা হবে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগকারীকে বাংলাদেশে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও নিশ্চিত হবে।

উপসংহার

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়। এ বিজয় অর্জনে দেহের রক্ত ঝরাতে হয়নি বটে, তবে এ কাজে নিয়োজিত সবাইকে রাত-দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম আর সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টা এবং কূটনৈতিক দৃঢ়তা প্রদর্শনের ফলে দেশের মূল ভূখণ্ডের সমপরিমাণের চেয়েও বেশি সমুদ্র এলাকা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তবে অনন্য এই বিজয়কে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে প্রকৃত অর্থে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, সমুদ্রসীমা জয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমরা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পাড়ি দিলেও কাজের অনেকাংশই এখনো বাকি। আর তাই আন্তর্জাতিক আদালতে পাওয়া বিজয় নিয়ে আমাদের একদমই আত্মতুষ্টিতে ভোগা চলবে না এবং সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব করাও সমীচীন হবে না; বরং আমাদের উচিত হবে বিশাল এই সমুদ্র এলাকায় মৎস্য, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের যথার্থ আবিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে কীভাবে লাভবান হওয়া যায়, সে সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং সে অনুযায়ী আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ কথা সত্যি, সমুদ্রকেন্দ্রিক ব্লু ইকোনমি আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটা বিষয়। তারপরও আমাদের ব্লু ইকোনমির গুরুত্ব যতদ্রুত সম্ভব অনুধাবন করতে হবে এবং এ সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যাতে করে আমরা উন্নয়নের নতুন অভিযাত্রায় শামিল হতে পারি।

তথ্যসূত্র

ইন্টারভিউ :

১। ইন্টারভিউ, কমান্ডার আহমেদ আমিন আব্দুল্লাহ, পিএসসি, এক্স, বিএন, ডিএস, ডিএসসিএসসি, মিরপুর।
২। ইন্টারভিউ, প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। ইন্টারভিউ, প্রফেসর ড. শহিদুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুস্তিকা, জার্নাল ও আদালতের কার্যবিবরণী :

৪। Hoque, Muhammad Nazmul, 2005-2006, 'The Legal and Scientific Assessment of Bangladesh's Baseline in the Context of Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea', United Nations – The Nippon Foundation Fellow, National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland.

৫। International Tribunal for the Law of the Sea, 2012, List of cases: No. 16, 'Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal', Bangladesh/Myanmar Judgement.

৬। Alam, Md Khurshed, Rear Admiral (Retd), 2012, 'Delimitation of Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar by the ITLOS', The Northern University Journal of Law, Vol. III, Dhaka.

৭। Haque, AKM Emdadul, 'Principles of settling disputes on delimitation of maritime boundaries: a review of cases relevant to the Bay of Bengal and Bangladesh', Dhaka.

৮। Mohiuddin, Mohammad, 2014, 'Delimitation of Maritime Boundaries: Bangladesh Perspective', LAP Lambert Academic Publishing, IMO International Maritime Law Institute, Malta.

৯। Rashid, Harun ur, 2014, 'India-Bangladesh: UNCLOS and the Sea Boundary Dispute', Bangladesh- Articles, Institute of Peace and Conflicct Studies, Dhaka.

ইন্টারনেট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখাসমূহ :

১০। http://www.jugantor.com/first-page/2014/07/09/120573.

১১। https://www.google.com.bd/search?q. সমুদ্র বিজয়

১২। http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/262825.

১৩। http://www.somoyerkonthosor.com/news/12426.

১৪। Ghani, Moin, 2012, "A 'Great Win' for Bangladesh", Tha Daily Star, http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=227828, 27 March 2012.

১৫। UNCLOS Annex VII- Tribunal decides Bangladesh-India maritime boundary dispute, http://hsfnotes.com/arbitration/2014/07/15/unclos-annex-vii-tribunal-decides-bangladesh-india-maritime-boundary-dispute/, Herbert Smith Freehills, 15 July 2015.

লে. কর্নেল কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি, আর্টিলারি, ১১ জুন ১৯৯৮ সালে ৩৮তম বিএমএ দীঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে কমিশন লাভ করেন। তিনি পাকিস্তানে এয়ার ডিফেন্স গানারি স্টাফ কোর্স এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর থেকে আর্মি স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। বিভিন্ন সামরিক জার্নাল ও দৈনিক সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত তার লেখা পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আর্টিলারি স্কুলে প্রশিক্ষক গানারি, ডিজিএফআই সদরদপ্তরে জিএসও-২ (সমন্বয়), সদর দপ্তর এএসইউতে সেনাপ্রধানের নিরাপত্তা অফিসার, সেনা সদর, এমও পরিদপ্তরে জিএসও-২ (অপস্) এবং একটি মাইনর ইউনিটের অধিনয়কসহ অন্যান্য রেজিমেন্টাল নিযুক্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ৩৭ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত আছেন।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের স্মরণীয় উক্তি

বাংলাদেশের সৈনিক,
তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী
–জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমি সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম
এটা জানার জন্য যে, কী কী বস্তু ছাড়া
জীবনযাপন করা সম্ভব
–সক্রেটিস

নেতৃত্ব হচ্ছে অধীনস্তদের ভুলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ
করা আর কৃতিত্বের ভাগ অধীনস্তদের দেওয়া
–ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার

অস্ত্র যুদ্ধ জয় করে না, যুদ্ধ জয় করে সৈনিকেরা।
সৈনিক ও সমরনায়কদের চেতনাই
যুদ্ধে জয়ী করে
–জর্জ প্যাটন

সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন

ফোর্সেস গোল-২০৩০-এর আলোকে একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলছে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন। অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আধুনিক সমরাস্ত্র।

সেনাবাহিনী

মেইন ব্যাটল ট্যাংক ২০০০ (MBT 2000)

চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক এমবিটি-২০০০ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। সর্বাধুনিক এই ট্যাংক শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে ব্যবহৃত ট্যাংকের মধ্যে অত্যাধুনিক ট্যাংক হিসেবে বিবেচিত। তিনজন ক্রু দ্বারা পরিচালিত এই যুদ্ধযান যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর যেকোনো সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে সক্ষম।

ওয়েপন লোকেটিং র‍্যাডার (WLR)

আর্টিলারি রেজিমেন্টকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চায়না থেকে ডব্লিউএলআর (WLR) ক্রয় করা হয়। ৩.০১-৩.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিচালিত অত্যাধুনিক এ রাডার শত্রু দ্বারা নিক্ষেপিত আর্টিলারি গোলা নির্ভুলভাবে জিপিএস পদ্ধতির মাধ্যমে শনাক্ত করতে সক্ষম।

সেলফ প্রোপেলড গান

সেলফ প্রোপেলড গান আর্টিলারি কোরে সংযোজিত একটি অত্যাধুনিক ও দূরপাল্লার কামান। কম্পিউটারাইজড আর্টিলারি ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত এই গানগুলো আইএনএস ও জিপিএসের মাধ্যমে নিজ অবস্থান নির্ণয় করাসহ বিভিন্ন ধরনের সর্বাধুনিক গোলা মিনিটে চার রাউন্ড করে ৪১ কিলোমিটার দূরত্বে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ফায়ার করতে সক্ষম। আর্মার্ড প্রোটেকশন, এয়ার ডিফেন্স মেশিনগান, রান ফ্ল্যাট টায়ার ও অটোলোডিং সিস্টেমসংবলিত ১৫৫ মি.মি. সেলফ প্রোপেলড গানসমূহ মেকানাইজড ফোর্সকে দ্রুত ও কার্যকরভাবে ফায়ার সহায়তা দিতে অত্যন্ত উপযোগী।

ফ্রিগেট বানৌজা আবু বকর

১। দৈর্ঘ্য : ১০৩.২২ মিটার

২। প্রস্থ : ১০.৮৩ মিটার

৩। আর্মামেন্টস : C802 SSM System, 100mm Gun System, 37mm Gun System

৪। সেন্সর : Navigation Radar, Search Radar, Electronic Countermeasure System

৫। কমিশনিং : ১ মার্চ ২০১৪

ফ্রিগেট বানৌজা আলী হায়দার

১। দৈর্ঘ্য : ১০৩.২২ মিটার

২। প্রস্থ : ১০.৮৩ মিটার

৩। আর্মামেন্টস : C802 SSM System, 100mm Gun System, 37mm Gun System

৪। সেন্সর : Navigation Radar, Search Radar, Electronic Countermeasure System

৫। কমিশনিং : ১ মার্চ ২০১৪

ফ্রিগেট বানৌজা সমুদ্রজয়

১। দৈর্ঘ্য : ১১৫.৩০ মিটার

২। প্রস্থ : ১২.৮০ মিটার

৩। আর্মামেন্টস : 1 x 75mm Gun and 2 MK 36 SRBOC

৪। সেন্সর : Navigational Radar, Search Radar

৫। কমিশনিং : ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪

Yak-130 Combat Trainer বিমান।
এটি একটি চতুর্থ প্রজন্মের প্রশিক্ষণ ও হালকা যুদ্ধবিমান।

K-8W Jet Trainer বিমান।
এটি একটি জেট প্রশিক্ষণ বিমান।

Mi-171SH হেলিকপ্টার।

Mi-171SH হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে Utility ও Armed Helicopter হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

PROMOTING JOINT TRAINING ENVIRONMENT FOR COASTAL DEFENCE IN BANGLADESH

Lieutenant Colonel Humayun Quyum, afwc, psc

Introduction

The character of today's warfare makes it imperative that Bangladesh Armed Forces fight as a joint team by integrating three services. Teamwork in joint operations is an essential ingredient in any battle. The doctrine for joint and combined operations needs to be practiced during peacetime for successful prosecution during war. Joint training among the three services is important for promoting inter services cooperation, understanding and synchronized action in war. The training system should form the basis to meet the battlefield challenges of the next millennium. So it is necessary to train and prepare for joint warfare, which is only possible by undertaking joint training with elements of three services under a well-coordinated plan.

Bangladesh is a littoral country with a funnel shaped sea approach. It has about 700 kilometers coastline flanked by India and Myanmar. The country's economy is mostly dependent on the sea lines of communications (SLOC). So, the defence of SLOC and the coastal area is essential for the country. The geography of the country demands all out and constant preparedness in undertaking effective amphibious operations and defence against amphibious operation. At wartime some segments of our territory are prone to be cut off from the main body of the land. So, tri-service joint training on amphibious operation is a necessity to keep our defence potentiality effective. Therefore, there is a dire need to put major effort to guard against any likely future amphibious landing, which would involve joint effort by the three services. Furthermore, during the staff ride in Armed Forces War Course 2014 visit to 24 Infantry Division and Naval Base at Chittagong, it was realistically felt that Bangladesh need to have a well-coordinated coastal defence for which joint training is a must.

Though Coastal Defence operation demands joint training in a joint environment but much of emphasis on the issue is not seen by any of the services. Therefore, an endeavour is taken to evaluate the existing joint training environment and put forward few suggestions in promoting better joint training environment for coastal defence in Bangladesh.

Aim

The aim of this paper is to study the present state of joint training on Coastal Defence and suggest few modalities for better joint training environment for Coastal Defence by the Armed Forces.

Jointness and Historical Perspective

The concept of jointness itself is a force multiplier, which must be explored to the fullest. Bangladesh must prepare itself to fight in a joint environment for creating deterrence and combat readiness. Jointness can be achieved by meshing the war fighting capabilities of the three services and providing them with common focus for conducting military operations.

Historic Landings.

Operation Overlord. The largest ever amphibious operation was conducted during the Second World War on 6 June 1944 by the Allied Forces against the Axis Forces and contributed significantly in the overall result of the war.

Inchon Landing. Another famous invasion known as Inchon Landing was conducted during the Korean War in 1950 by Douglas MacArthur where he achieved complete surprise and the South Koreans were taken aback.

Liberation War.[1] During War of Liberation, Chief of Staff of Indian Army ordered a battalion group to move to Cox's Bazar by sea to prevent Pakistani troops from escaping to Burma. A group comprising of one third Gorkha Rifles, two companies of 11 Bihar and some mortars was hastily collected and was named as 'Rome Force'. This force was placed under command of Commander Artillery of 8 Mountain Division and put on a merchant ship to sail to Cox's Bazar on 12 December from Calcutta. A Naval contingent of 50 personnel was also sent to accompany the main force. On reaching Cox's Bazar on 14 December the force was transferred to two Landing Ship Tanks, INS GULDAR and GHARIAL.

However, the place was not found suitable for beaching the Landing Ship Tanks and no other type of landing craft was available with the force. The mission was a total failure and only 12 men could disembark, out of which two of them drowned.

All the examples mentioned above contributed immensely to the result of the campaign; thus it focuses the importance to guard the coastal areas of a country by potent forces comprising all the components.

Existing Joint Training Environment on Coastal Defence

Doctrinal Aspect. The principle of joint training doctrine is to 'train as you fight — Fight as you train', and the training provides a clear guidance to actions.[2] Bangladesh has already formulated a draft Joint Warfare Doctrine. The published draft 'Joint Warfare Doctrine' though has emphasized on the defence against amphibious assault, but did not focus anything about the

1 Lieutenant Colonel Md Abu Sayed Siddique, afwc, psc, Possible Amphibious Threat in Bangladesh Perspective and Coordination Required at Different Level to Counter it, a paper written at National Defence College, Mirpur, Dhaka, 2007.

2 Lieutenant Colonel John C, Dibrell, Military Review (May 1994) 'Train to Deploy', P. 98

joint training. Theoretically, it describes and discusses the way to integrate and employ land, air and maritime forces in joint action.

However, the published draft 'Joint Warfare Doctrine' is yet to go through the test.

Conduct of Annual Sea Exercise. Bangladesh Navy conducts an annual sea exercise namely 'SEA THUNDER' for two weeks where a small participation of a platoon size force of Air Defence Artillery of 24 Division takes part. Actually, it becomes purely Naval Exercise and Army role is not integrated in a meaningful way. There is no specific guidance for conducting joint exercise for coastal defence also.[3]

Conduct of Command Post Exercise (CPX). Headquarter 24 Infantry Division had conducted few CPXs to validate its operational plan where coastal defense was practiced as part of their operational responsibility. While conducting CPX, Navy and Air Force was also integrated. But, the exercises could not be fully effective due to the absence of specific guidelines for conducting such kind of exercise and clearly spelled out responsibility for any of the services headquarters for joint endeavour.[4]

Insufficiency in Existing Joint Training Environment

General. Joint training imperatives are derived from the commander's philosophy, higher commander's guidance, the services capabilities and the limitations.[5] But, while carrying out joint training, single service conceptual differences and problems can be identified.

Mental Set up.[6] To be candid, the first and foremost problems are the mental setup of the commanders to work in joint environment from same platform. Often it is found that official correspondence is subsided by the personal relationship between the officers. Since after BMA, there are also very less joint-courses between the officers before staff course which hinder opportunity in developing desired mental set up for training defence issue in joint environment.

Absence of Specific Guidance from Armed Forces Division (AFD).[7] AFD is yet to have a coordinated joint plan where all three services can plan any kind of training on coastal defence. Due to the absence of specific guidelines and clearly spelled out responsibility for conducting any kind of joint exercise on coastal defence it does not take place.[8]

Less Number of Exercises, There is no better way to evaluate performance of armed forces in peace time other than exercises. Over the

3 The information was gathered from Lieutenant Colonel Sazzad Sarwar, psc Commanding Officer, 33 BIR Bangladesh Army who served as staff officer at AFD.

4 The information was gathered from General Staff Officer-1(Operation) 24 Infantry Division.

5 Dibrell, op. cit. P. 98.

6 Lecture given by Chief of Army Staff at National Defence College, Mirpur, Dhaka, Bangladesh in 2014.

7 Sazzad, Opchit

8 Discussion with Lieutenant Colonel Sazzad Sarwar,psc who served as staff officer at AFD.

years, due to the absence of instruction for conducting joint training very few of such joint exercises have taken place and whatever has taken place was not very effective and performances of those were not very satisfactory.[9]

Other Related Inadequacies.[10] Few other inadequacies related to the joint training on coastal defence was identified during the conduct of CPX and field exercises.

- Lack of adequate understanding on the importance and requirement of coastal defence.
- Lack of knowledge on procedural aspect of coastal defence mechanism.
- Lack of knowledge by the services about each other's role and capability about coastal defence specially, at tactical level.
- Lack of coordination among the services at formation or base or flotilla level.
- Lack of resources in terms of strength and equipment and also technical constraints specially, on the part of Navy and Air Forces.
- Lack of adequate fund for joint-expenditure to conduct joint exercises.
- Lack of inter operative equipment especially communication equipment.
- Finding difficulties in managing suitable time together by all three services at planning level to plan early for joint-exercises.

Inadequate staffing in AFD to plan for joint exercise.

Ways to Promote Joint Training Environment

Developing a Professional Mindset.[11] To achieve the joint environment from same platform, service members need to be thoroughly professional and put profession always in top. This mindset could be achieved by more interaction, operations, exercises and training etc between the members of the services. Officers may also be posted in inter-service appointments more in numbers to develop a sense of understanding of each other.

Establishment of Joint Forces Headquarters (JFHQ). As per 'War Book', joint service command headquarters will be established only when the war is declared by honourble President. But in peace time having a JFHQ would bring the imagination in reality and related problems could be solved easily. In absence of such headquarters, rotating the PSO of AFD in turn from each service is likely to address the unique problems of services and finally enhance the capability of joint operation.

Joint Training at All Levels.[12] Joint training at junior officers level and further below may be increased so that desired interaction, coordination and

9 Discussion with Captain Khandaker Azim, BN who served as staff officer in Naval Head Quarters.

10 Brief given by staff officers during Staff Rides in 55 Infantry Division, 24 Infantry Division and Naval Base Chittagong in June 2014.

11 Lecture given by Chief of the Naval Staff on Formulation of Maritime Strategy for Bangladesh at National Defence College, Mirpur, Dhaka, Bangladesh, 2014.

12 Discussion with Commander Mohammad Mamunur Rashid, (TAS), psc, BN.

mutual confidence develop among the members more.

Conduct of More Joint Exercises.[13] Like previous and existing joint exercises in coastal areas, more number of joint field exercises may be planned every year. At least the CPX should take place every year. For effectiveness, Armed Forces are to retain true jointness and professionalism.

Deciding the Modalities of Training.[14] Joint training, exercises, and interoperability demands to be easy and comfortable. Besides CPX, field exercise will be the most effective means of conducting training on coastal defence. Three services can conduct the training under a joint environment planned by AFD.

However, training can be better organised and conducted if the responsibility is given to a particular services headquarters. The financial implications may be decided upon on a mutual basis.

Assign Training Responsibility. AFD may direct Army Headquarter to detail 24 or 10 Infantry Division for such responsibility where Naval and Air Headquarters will provide with required support. Responsible Infantry Division may organise the training with timely coordination of Naval and Air Force Bases located in Chittagong. General Officer Commanding (GOC) can be appointed as the director of the exercise. One must understand that without active support and active participation of all the three services it will be difficult to achieve the training objectives and make the exercise asuccess.

Setting Training Objectives. Coastal Defence is a critical operation as far as its mechanism is concerned. Though the main responsibility for coastal defence depends on land forces, the role of Navy in regards to seaward defense is also significant.

However, Air Force is employed primarily for reconnaissance, surveillance and air defence. In absence of maritime air resources they also provide support to the naval forces within their capability. Basing on the role and capability of all the three services following objectives may aim to achieve during training:

- Examining of functioning of the joint command structure when the exercise is planned under a Joint Task Force (JTF).
- Locating potential landing sites or places for the assault and selecting area for shore-based defence.
- Practicing seaward defence by the Naval Forces.
- Practicing joint air-defence system and determining the role and employment of Air Force.
- Planning airmobile operation to counter assaulting forces by employing land forces specially the reserve.

13 Discussion with Commander Mohammad Hafizur Rahman Afrad, (S), psc, BN.

14 Discussion with Commander Kazi Shah Alam, (C), psc, BN.

- Practicing of laying obstacles and barriers for shore-based defence.
- Testing communication network among the forces.
- Integrating civil resources such as merchant ships for conducting operation.
- Finalising Joint Air Defence plan to conduct any kind of joint exercise including services AOR of Air Defence.

Training Team. A team of officers comprising of members from all three services including representatives from paramilitary forces as needed may be formed who would develop the plan for the exercise for a particular year. AFD may put forward their specific guidelines to this team, if necessary. The plan should mention the requirement of resources and the apportionment that has to be shared by each service. The team may also propose for an exercise control team who would conduct and control the exercise. Suggested plan for the exercise may be submitted to the GOC 24 or 10 Infantry Division for necessary approval and vetting.

Doctrinal Guidance. The Section 19 of the draft JWD may be augmented to serve the required purpose and include joint training part on Coastal Defence in details.

Conclusion

Joint training entails every service to apply joint doctrine, tactics and rehearse the technique and procedures of integrated command, control and coordination. The business of armed forces should be to counter threat to security. Understanding the basic principles and techniques of Joint Warfare for its useful implementation, we should have specific joint training objectives based on Joint Training Doctrine. While carrying out joint training, single service conceptual differences and problems can be identified. All three services have their own doctrines, which differ from each other in their concept as well as in execution. Following a common doctrine and frequent interaction can narrow such differences down. This can be evolved through joint service exercises. Once the doctrine is formulated, the areas of weakness would be identified and removed.

Presently, all three services, although have achieved considerable progress in single service training, but they lack in coordination and harmonious interaction. Though over the years, some joint training was carried out, yet a joint training doctrine could not be formulated.

Amphibious operation is always a delicate and complicated operation. Considering the capabilities of potential adversaries, the possibility of an amphibious operation cannot be over ruled in the coastal areas of Bangladesh. Therefore, preparation for conducting counter amphibious operation is also vital. For that, joint training is a requirement of time. So, an effective coordination at the Services Headquarters level as well as command level is needed for conducting effective joint training on Coastal Defence.

Having right mental set up by all the services at all possible level necessary joint training should be planned and implemented regularly. Realistic joint exercise including CPX also can promote the success of jointness in achieving better preparedness by Bangladesh Armed Forces. The Joint Warfare Doctrine which is in the draft form needs to be finalised through legal procedures. After this a Joint Training Doctrine needs to be formed on the basis of the earlirer document.

BIBLIOGRAPHY

PRECIS/DOCUMENT

1. Draft Joint Warfare Doctrine-2006 (JWD-2006), Published by Armed Forces Division, Dhaka, Bangladesh,
2. Draft Joint Air Defence Plan of Bangladesh, published by Armed Forces Division, Prime Minister's Office, Dhaka.
3. Forces Goal 2020 of proposed 'National Air Defence Plan, Armed Forces Division, Prime Minister's Office, Dhaka

ARTICLE

4. Preston Anthony, Coast Defence Today, Maritime Defence, May 1997.
5. Lieutenant Colonel John C, Dibrell, Military Review (May 1994) 'Train to Deploy'.
6. Wing Commander Fakhrul Alam, Reform and Development of Bangladesh Armed Forces for a Credible Deterrence by 2020, group research paper written in Defence Services Command and Staff College, Dhaka, Bangladesh, October 2005.
7. Lieutenant Commander Saidur Rahman BN, Coastal Defence, concept paper written in Defence Services Command and Staff College, Dhaka, Bangladesh, November 2000.
8. Lieutenant Commander Ziaur Rahman BN, Coastal Defence for Bangladesh, concept paper written in Defence Services Command and Staff College, Dhaka, Bangladesh, January 2006.
9. Lieutenant Commander Mahmud Hossain BN, Coastal Defence for Bangladesh, dissertation to Defence Services Command and Staff College, Dhaka, Bangladesh, November 2000.
10. Commander M Ashraful Haq BN,Integrated Coastal Defence for Bangladesh, Research Paper written at National Defence College, Mirpur, Dhaka, 2007.
11. Lieutenant Colonel MD Abu Sayed Siddique, afwc,psc, Possible Amphibious Threat in Bangladesh Perspective and Coordination Required at Different Level to Counter it, a paper written at National Defence College, Mirpur, Dhaka, 2007.

DISCUSSION

12. Discussion with Captain Mohammed Sharif Uddin Bhuiyan, (S), psc, BN.
13. Discussion with Captain Khondkar Misbah-ul-Azim, (TAS), psc, BN.
14. Discussion with Commander Mohammad Mamunur Rashid, (TAS), psc, BN.
15. Discussion with Commander Mohammad Hafizur Rahman Afrad, (S), psc, BN.
16. Discussion with Commander Kazi Shah Alam, (C), psc, BN.
17. Discussion with Lieutenant Colonel Shariful Islam, psc , General Staff Officer (Grade 1) 24 Infantry Division.

18 Discussion with Lieutenant Colonel Sazzad Sarwar, psc , Commanding Officer, 33 BIR.

BRIEF/LECTURE

19. Lecture given by Chief of Army Staff at National Defence College, Mirpur, Dhaka, Bangladesh in 2014.
20. Lecture given by Chief of the Naval Staff on Formulation of Maritime Strategy for Bangladesh at National Defence College, Mirpur, Dhaka, Bangladesh, 2014.
21. Brief given by staff officers during Staff Rides in 55 Infantry Division, 24 Infantry Division and Naval Base Chittagong in June 2014.

WEBSITES

22. "Military Wikipedia, Open Data" at www.en.wikipedia.org/wiki/Electronic_warfare, visited on 30 April 2015.
23. "Coastal_Defence", at www. Wikipedia.com.
    (the free encyclopedia Coastal_defences.htm) visited on 30 April 2015.

Lieutenant Colonel Humayun Quyum, afwc, psc, was commissioned in the Tigers family in June 1993. Apart from serving in no of Infantry Battalions, he served as G-3 (Operations), G-2 (Intellegence) and Brigade Major in different Infantry Brigade Headquarters. He also served as an Instructor class 'B' in Tactics Wing and as Instructor class 'A' in UCSC Company of SI&T. He is a graduate from DSCSC. He commanded 21st Infantry Battalion and served as a deputy president in ISSB. Under blue helmet he served in UNAMSIL and MONUSCO. Presently he is serving as General Staff Officer (Grade One) at Headquarters 17 Infantry Division.

PURSUING BLUE ECONOMY AND MARITIME SECURITY

Commodore M Musa, (G), NPP, rcds, afwc, psc, BN

Introduction

The importance of Blue Economy to mankind cannot be underestimated; over 70% of earth is covered by ocean; 90% of the world's trade in goods is conducted by sea. Oceans transcend states. They connect all states to each other. And, the states must harness these connections for development, not just through enrichment. This is the crux of what it means to develop a Blue Economy: to create partnerships that allow harnessing the oceans for a paradigm shift in terms of action towards sustainable development.[1] The Blue Economy concept aims to transform unsustainable practices into sustainable ones and also embraces the vista of untapped potential that is available through enhanced exploration and sustainable exploitation of our oceanic spaces. The emergence of the concept of 'Blue Economy' means the economic wealth to be found in and under the sea. This was first taken seriously at the 2012 United Nations (UN) Conference on Sustainable Development (better known as Rio+20).

With oceans covering two-thirds of the earth's surface, relationship of human race with these vast bodies of water is an essential one. The oceans, in a real sense, are the bloodstream of this planet. They are also the source of livelihood for large numbers of people — over three billion — who depend upon them. Oceans and coastal regions are the key to poverty reduction and support a range of industries from fisheries to shipping, from tourism to marine transportation, often providing income opportunities for vulnerable groups such as women and youth. Ocean resources are the major source of protein for more than 2.6 billion people globally and are a regulator of greenhouse gases by capturing and storing 30% of the carbon that humans produce.

Therefore, it is necessary to highlight some underlying facts regarding the opportunities of Blue Economy and security of our maritime resources leading to promote smart, sustainable and inclusive growth while focussing on the national interest at sea.

Challenges towards Blue Economy

In order to use our sea resources in a sustainable manner, we need to understand extensively about the hydrograph and circulation, ecosystem characteristics and function, resource potential and sustainability of the regional Ocean or sea areas. Our present understanding of the Indian Ocean,

1 President James Michel of Seychelles addressing on First Blue Economy summit in Abu Dhabi on 21January 2014.

in general and the Bay of Bengal in particular, is rudimentary. The characteristics of Bay of Bengal are primarily:

- Tropical basin land locked in the north
- Forced by seasonally reversing monsoon winds
- Low saline basin due to large river influx and oceanic precipitation site of tropical cyclones
- Forms a part of the Indo-Pacific warm pool

With nearly 160 million people living together at sea level, the lives of many millions in Bangladesh are affected by the slightest climatic variation, let alone the dramatic threat of global warming. The possibility of an eight-inch rise in sea level in the Bay of Bengal by 2030 would devastate more than ten million people.[2] The partial melting of Greenland ice alone over the course of the twenty-first century could inundate more than half of Bangladesh in salt water. Though such statistics and scenarios may be debated by scholars, one thing is certain: Bangladesh is the most likely spot on the planet for the greatest humanitarian catastrophe in history.

Atop the Bay of Bengal, the numberless braids of the Ganges, Brahmaputra, and Meghna rivers have formed the world's largest, youngest, and most dynamic estuarial delta. The spring floods from the north, originating with the snowmelt in the Himalayas, swell the three great rivers. Then in June, lasting for three months, comes the monsoon from the south, up from the Bay of Bengal. Calamity threatens when the amount of water arriving by river, sea, or sky is tampered with, whether by God or by men. The result is silt, or loose soil, that traps water in place, hence water logging.

Moreover, the regional countries on the North are appropriating Ganges and Brahmaputra water for irrigation schemes, thus further limiting freshwater flows into Bangladesh, causing drought. Meanwhile, in the Bay of Bengal, global warming appears to be causing a sea-level rise. This brings salt water and sea-based cyclones deeper inland.

In this backdrop, Bangladesh not only shows determination to lead on sustainability, but is a strong advocate for maritime cooperation and supports other maritime countries across the Bay of Bengal and Indian Ocean in achieving their sustainable development goals.

Moreover, the 'Blue Economy' has entered the United Nations (UN) lexicon during the 2011-12 preparations for the Rio+20 Conference and come to mean a way of life. Bangladesh mainly depends on sea from fishing to trade, scientific research to energy sports to tourism industry, maintaining the health of the coastlines and mangrove forests. So, the Blue Economy places a renewed emphasis on the critical need to address the long-term sustainability of the international waters. Today's requirement is to find the

2 Kaplan Robert D, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, Random House, USA Reprint edition (September 13, 2011).

right policy frameworks and commercial opportunities to balance and protect the health of the sea.

The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provided the legal framework for the conservation and sustainable use of the oceans. The issue of Blue Economy has been widely discussed at different expert groups, meeting on Oceans, Seas and Sustainable Development, Global Ocean Commission and the prominence has also been given to oceans and seas in the UN five-year Action Agenda 2012-2016.[3]

The Blue Economy: Opportunities

Blue Economy offers a suite of opportunities for sustainable, clean, equitable blue growth in both traditional and emerging sectors:

Shipping and Port Facilities. 80% of global trade by volume, and over 70% by value, is carried out through sea and handled by ports worldwide. World seaborne trade grew by 4% in 2011, to 8.7 billion tonnes despite the global economic crisis and container traffic is projected to triple by 2030. Coastal countries need to position themselves in terms of facilities and capacities to cater for this growing trade and optimise their benefits. Shipping is the safest, most secure, most efficient and most environmentally sound means of bulk transportation — with declining rates of accidents, zero terrorist incidents, improving turnaround of ships and significant reductions in discharges to sea or emissions to air.

Fisheries. Fish accounts for 15.7% of the animal protein consumed globally. The value of fish traded by developing countries is estimated at US$ 25 billion making it their largest single trade item.

However, Global Ocean Observing System (GOOS) and LME assessments show significant warming trends from which model projections 2040-2060 forecast a steady decline in ocean productivity.

Aquaculture. Aquaculture is the fastest growing global food sector now providing 47% of the fish for human consumption. Fish used for human consumption grew more than 90 million tonnes in the period 1960-2009 (from 27 to 118 million tonnes) and aquaculture is projected to soon surpass capture fisheries as the primary provider of such protein. Growth in aquaculture sector in Asia, which accounts for more than 89% of the global production, is more than 5% a year. Aquaculture under the Blue Economy will incorporate the value of the natural capital in its development, respecting ecological parameters throughout the cycle of production, creating sustainable, decent employment and offering high value commodities for export.

3 Rear Admiral M. Khurshed Alam, Secretary, MAU, MOFA, 'Ocean/Blue Economy For Bangladesh' available at www. http://mofl.portal.gov.bd/ accessed on 20 August 2015.

Tourism. Marine and coastal tourism is of key importance to many developing countries. Tourism is a major global industry. In 2014 tourism supported 9% of global jobs and generated US$ 1.3 trillion or 6% of the world's export earnings. International tourism has grown from 25 million in 1950 to 1,035 million in 2012 and the UNWTO forecasts further growth of 3-4% in 2013; the forecast for 2030 being 1.8 billion. Trends in aging populations, rising incomes and relatively low transport costs will make coastal and ocean locations ever more attractive. Currently, the cruise tourism is the fastest growing sector in the leisure travel industry.

Energy. In 2009, offshore fields accounted for 32% of worldwide crude oil production and this is projected to rise to 34% in 2025 and higher subsequently, as almost half the remaining recoverable conventional oil is estimated to be in offshore fields — a quarter of that in deep water. Deep water oil drilling is not new, but market pressures are making the exploration for and tapping of evermore remote reserves cost effective, bringing the most isolated areas under consideration. Oil will remain the dominant energy source for many decades to come but the oceans offer enormous potential for the generation of renewable energy — wind, wave, tidal, biomass, and thermal conversion and salinity gradients.

Biotechnology. The global market for marine biotechnology products and processes is currently estimated at US $ 2.8 billion and projected to grow to around US$ 4.6 billion by 2017. Marine biotech has the potential to address a suite of global challenges such as sustainable food supplies, human health, energy security and environmental remediation. Marine bacteria are a rich source of potential drugs. In 2011, there were over 36 marine derived drugs in clinical development, including 15 for the treatment of cancer. The potential scope is enormous. In the very short term, the sector is expected to emerge as a niche market focused on high-value products for the health, cosmetic and industrial biomaterials sectors.

Charting a New Course for Bangladesh with the Blue Ocean/Sea

The Blue economy initiative is required for promoting synergies and fostering framework conditions that support specific maritime economic activities and their value chains. Bangladesh among the coastal countries has targeted the preparatory process leading upto the first International Workshop on Blue Economy in 1-2 September 2014 in Dhaka where Honourble Prime Minister emphasised that the Blue Economy could play an important role in the economic uplift of the country in the context of poverty alleviation, ensuring food and nutrition security, combating climate change

impacts. Underlining Blue Economy as a window of opportunity for development, the Prime Minister expressed her resolve to turn the Bay of Bengal to a hub of economic development and prosperity; and observed that marine resources and services could significantly contribute to development of potential sectors such as pharmaceuticals and agro-based industry and could also enhance foreign trade and foreign exchange. The prime minster, however, identified the lack of skilled human resource, institutions and technology as key challenge for Bangladesh to effectively utilise the marine resources.

However, she re-affirmed Bangladesh's commitment to conservation and balanced development of natural resources keeping integrity of environmental and bio-diversity aspects while pursuing development for the people of the country. She expressed hope and called for pragmatic guidance and perspectives towards development of blue economy.

Today, the Blue Economy is a roadmap of hope for attainment of sustainable development, taking into account advantages and strategies of managing the oceanic resources. It highlighted the importance of engagement on: increasing sustainable fishing capacity and creating alternative job opportunities; promoting sustainable management of small-scale marine fisheries; supporting artesian communities' access to information, technology, finance, regulation and governance processes with a view to securing them year-round livelihood from alternate sources; enhancing capture fisheries' share in fish production through protecting and restoring critical habitats; collaborating among international community to end over fishing, effectively regulating harvesting and ending illegal-unreported-unregulated (IUU) fishing and destructive fishing practices; and supporting the countries-in-need on implementation of their science-based management plans towards restoration of fish stocks to sustainable yield level; strengthening regional governance and institutions in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) management.

Defence Capability and Security at Sea

There is no alternative but to augment the defence capacity of the country through modernisation of the armed forces. As part of the initiative to modernise the defence system, the government has taken steps to provide training to three forces to enhance their operational capacity and efficiency. Side by side, the efforts are on to procure modern equipment and modern technology-based military hardware and to enhance other benefits for the defence forces.

The nature of security classification has been changed globally. And the military has to change its role as well. Bangladesh Armed Forces, being a hard power of Bangladesh, has produced soft power for the country through its participation in the different operations at sea against non-state actors contributing to the national economic interest beside participating in UN peacekeeping missions abroad. Over the last few years, Bangladesh has been

facing enormous challenges from different sources other than any military. Bangladesh Armed Forces is trying to identify those threats, pursuing to frame the defence policy and plan to equip itself to thwart them. This means the military investment should be well planned considering the existing and forthcoming challenges.

Maritime Security Requirements of Bangladesh

Maritime Security is that component of national security which deals with sea and matters related to it. Being surrounded by India and Myanmar on three sides, the only outlet of the country to the entire world is through the Bay of Bengal in the south. About 93% trade of the country traverses through the sea. Sea is the lifeline of Bangladesh. So, Bangladesh needs to keep her Sea Lines of Communication (SLOC) open at all times. Law of the sea also attaches responsibility to the coastal states for maintaining law and order in their areas of jurisdiction. Since sea routes are prone to trafficking of smuggled goods and drugs, it has become mandatory for Bangladesh as a littoral state to counter it. Coupled with sea piracy and gunrunning, Bangladesh needs to maintain appropriate law enforcing agencies watchful round the clock.

Besides, the Bay of Bengal remains rough almost half of the year. Many fishermen lose their lives without getting much assistance from appropriate authority. In the big rivers and estuaries, passenger launches sink quite often during gusty wind because of their faulty construction or wrong navigation. Marine pollution has also become a serious problem in these days. Due to indiscriminate use of harmful chemicals in the field, reduction in the supply of water from the upper riparian countries and oil spills from age-old tankers; fish population of this water is getting migrated to other areas.

Looking at the host of problems in the maritime security matters it is high time to evolve some mechanism, which will pave the way for cooperation and friendship among national, regional and global aspects. Regional countries have important and growing maritime interests, which are of common in nature. The supply of energy particularly oil is becoming a major security concern in the SAARC Forum. To help in promoting a stable maritime regime in the region with the free movement of sea borne trade, exploitation of maritime resources and persuasion of their maritime intent with the agreed principles of international law is a dire necessity. The whole issue demands Bangladesh to have Maritime Governance and efficient functioning of different maritime agencies consisting of regulating bodies, military and constabulary services, private and public sector commercial operators, factors such as ports and harbours, ship-building yards and institutions for training, education and research. Being a developing country, the above agencies face innumerable challenges due to their constraints and limitations in terms of policy and tools or mechanism to function.

Sea Resources

Fisheries. Bangladesh being a resource constraint country needs to tap the treasure of sea. The sea areas of Bangladesh are reportedly having abundance of fish, hydrocarbon and mineral deposits, which needs to be discovered, unearthed and protected. Exclusive Economic Zone (EEZ) of Bangladesh is rich in fish stocks and spread over our four major fishing grounds distributed reasonably close to the coast. Marine fisheries contribute about 22% of the country's total fish production. There are about 13 lakh commercial fishermen of which a few lac are involved in marine fishing. It contributes 6.15% to the GDP of the country and 6.28% to foreign exchange earnings. However, indiscriminate fishing needs to be checked through implementation of appropriate fishery legislations.

Maritime Search and Rescue (SAR). The obligation of ships and craft to response in distress is one of the oldest traditions at the sea, which has been the basis of international convention. Bangladesh has a reasonably large maritime zone coupled with innumerable rivers. Frequent cyclonic weather causes many accidents. Timely action to salvage by rescue vessels will undoubtedly save many valuable lives and properties and install confidence among the seafarers. Bangladesh being a member of IMO needs to conduct SAR in the specific maritime zones. Cyclonic storm over the Bay of Bengal often floods many parts of the coastal area up to 10 feet tidal surge, coupled with gusty wind inundates vast areas and take lives of hundreds of fishermen every year. Bangladesh needs to work out some measures or mechanism to reduce such effects. Although Bangladesh is a signatory to Safety of Life at Sea (SOLAS) convention but she could not achieve the full capability yet to implement SAR jobs effectively. It is the duty of the Navy to coordinate it. The task requires availability of appropriate SAR resources and national search and rescue contingency plan.

Seaborne Trade. Almost the 93% of entire trade of Bangladesh traverses through sea. With the recent increase of terrorist activities, trade protection is not only a requirement during wartime or short of war situation but also during peacetime. Any disruption in its supply might cause grave situation unless it is imported through land borders i.e. from India. The situation is same for the supply of other strategic material as well. Bangladesh does not have sufficient reserves particularly Petroleum Oil Lubrication (POL) to meet demands even for a few weeks. This is a sector, which needs a lot of attention because without this the nation will come to a grinding halt.

Non-state Actors

General. Non-state actors challenge the sovereignty and affects both national and international security. The increased activities of non-state actors pose a threat to Bangladesh. Again, there is a possibility of transporting arms and drug by the insurgents of different states of the region

and beyond beside the domestic extremists through Bangladeshi waters. Smuggling is also a common activity in Bangladeshi waters which threatens country's economy.

Piracy. Though piracy only relates to acts conducted in waters outside the state jurisdiction, armed robberies against ships are increasingly cited as piracy by International Maritime Bureau (IMB). In the year 2014 alone, 21 such incidents (Indonesia had 100 and Malaysia had 24 incidents) have been reported [4] in the water of Bangladesh. The report also states that most attacks reported at Chittagong anchorages and these attacks in Bangladesh have fallen significantly over the past few years because of the efforts by the Bangladesh Authorities, i.e. maritime security forces.

Societal Issue

Illegal Migration. With growing economic disparity between Bangladesh and developed countries, people would naturally seek new opportunities abroad. But immigration laws are making land or air routes increasingly restrictive for the illegal migrants worldwide. Bangladesh Navy has been operating to prevent Human Trafficking. So far BN has apprehended six boats and 794 persons including traffickers in last one year. Hence, illegal immigrants have already begun to exploit maritime transportation. Thus, migration adds to maritime security concerns requiring greater monitoring and law enforcement at sea.

Natural Disasters. Bangladesh faces perennial threats of tropical cyclones. Tsunami and sea level rise also represent contemporary threats. The rise of global sea level by the end of year 2050 would mean that there is a high risk of coastal inundation by sea water. In the case of Bangladesh, the projected 1.44m rise of sea level would inundate 16 percent of the populated land, displace 13% of the population and lose 10% of the GDP. The issues confronting these natural disasters are forecasting meaningful warning signals to the areas, safety of ships and crafts at sea and their rescue and shelter capacity building. The rise in sea level will move the shoreline farther landward. Hence increasing tidal range and tidal wave action due to sea level rise is likely to augment coastal erosion in Bangladesh.

Existing Mechanism of Providing Maritime Security

The responsibilities of maritime safety and security and constabulary services are vested on primarily on the two security forces as described below briefly:

Bangladesh Navy (BN). The main and obvious function of BN is territorial defence and maintenance of national sovereignty. Besides, as a traditional role, BN is tasked with the protection and control of

4 ICC IMB Piracy and Armed Robbery against Ships – 2014 Annual Report.

- Energy, led by Myanmar
- Tourism, led by India
- Technology, led by Sri Lanka
- Fisheries, led by Thailand

Thus, it is suggested that the key players of the organisation such as Bangladesh, India, Myanmar, Thailand and Sri Lanka should actively discuss how to promote and develop sustainable blue economy in the Bay of Bengal. In this regard, the BIMSTEC may think about how to form a high level committee for a sustainable blue economy in the Bay of Bengal.

Maritime Security Measures Implementing the Blue Economy

Following measures are the suggestions regarding implementation of the Blue Economy.

Promoting Public Awareness. There are so many concepts and arguments about the importance of 'Blue Economy'. However, still very few people know what the concept of blue economy means. The general population is little ignorant about blue economy. That's the reason why it is important to promote a public awareness about the benefits of sustainable blue economy.

Social Cooperation. For this to occur, the people of coastal areas should see the tangible benefits of Blue Economy. Otherwise, there will be a great limitation to promote and achieve sustainable blue economy in the Bay of Bengal. The decision makers of Blue Economy must always think about how to directly trickle down the fruits of the new economy to the people of the coastal areas, especially the poor. In this perspective, we can pursue asustainable Blue Economy that will meet the developmental needs of the current generations without compromising the needs of future generations.

Necessity of Naval Power. Around the world, naval power is in fashion again. After more than a decade of entanglement in difficult and unpopular ground campaigns, Western powers are looking to their navies to provide an alternative, less costly lever of power. Big economic and political power shifts towards Asia and the South, rising nations are building up naval forces to assert territorial claims and to boost prestige. Smaller, coastal countries are increasingly aware of the need to protect and preserve offshore resources and trade. Sometimes this naval resurgence is presented in the strategic debate as a rejection of the recent past, and in particular of the recent land-focused wars in Afghanistan and Iraq.[5] In contrast, now might seem the moment to return to clear-cut, 'saltwater' business after the complexities of counter-insurgency and 'war among the people'.

5 The Utility of Naval Power, Jane's Navy International, January –February 2015, Vol120, Issue 1

various maritime activities. BN carries constabulary functions like patrolling to prevent piracy, smuggling, drug-trafficking, gun-running, pollution, illegal fishing etc. and provides humanitarian assistance including search and rescue at sea and disaster management. In fact, BN has become the main and leading force in maritime domain to safeguard the country's economic interests and exercise maritime control within the Exclusive Economic Zone (EEZ), the continental shelf and even in the high seas in pursuit of national interest according the law of the sea. Since inception, BN has been steadily progressing to achieve its goal. After the maritime disputes with Myanmar and India being settled in March 2012 and July 2014 respectively, there has been significant investment in naval capabilities, including new frigates, patrol craft, maritime patrol aircraft and multi-role helicopters, as well as plans to acquire submarines; a requirement for maritime-domain awareness and security is inspiring further spending. However, the overall capabilities of the fleets are not yet adequate to match the huge task in the vast maritime sector to fulfil its missions. BN with seventy plus ships, new aviation wing with few assets has the limitations to provide complete protection and control over the maritime area of jurisdiction. However, to support the overall maritime tasks, the country's navy must be suitably designed as an effective and balanced strategic instrument against numerous challenges posed by both state and non-state actors.

Bangladesh Coast Guard (BCG). Established in 1994, Bangladesh Coast Guard (BCG) has a broad and important role in internal maritime security which includes security, law enforcement, search and rescue, marine environmental pollution response, and the security to river, costal and offshore waterways. It now operates five riverine patrol boats, four Chinese origin Fast Patrol Boats received from BN, one patrol boat built in Malaysia and two patrol boats recently built in Bangladesh received from Chittagong Port Authority totalling a fleet of 12 small ships of limited capability. With the recent acquisition process of Offshore Patrol Vessel from abroad will certainly increase the capability of BCG to perform necessary constabulary tasks in the maritime field at present. Bangladesh has approximately 710 kilometres of coast line and securing such a huge coast is a difficult yet critical task.

International Cooperation among the Neighbouring Countries. As far as this matter is concerned, there is already a very meaningful multilateral organisation surrounding the Bay of Bengal, that is, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). However, so far very little has been done by the BIMSTEC in terms of sustainable blue economy in the Bay of Bengal, even though, since 1998, the organisation has identified six priority sectors of cooperation. They include:

- Trade and Investment, led by Bangladesh
- Transport and Communication, led by India

Regional Cooperation. Bangladesh has begun to pursue Blue Economy as a foreign policy 'priority' soon after it settled peacefully maritime disputes with India and Myanmar. Bangladesh now regards the Bay of Bengal as its 'third neighbour', considering the richness of its marine resources. But it lacks skills and manpower to extract those resources. Besides, the governments of this region are working closely to work in partnership. As such, during the recent visit of Indian Prime Minister to Bangladesh, there were joint declarations and Memorandum of Understanding (MoU) signed between Bangladesh and India on a number of issues including maritime cooperation. Indian PM in his speech said the agreement on blue economy 'opens a new area of economic opportunities'. Similarly, the Government of China also showed similar interest and approached to partnership in maritime cooperation and development of Blue Economy with Bangladesh, days after signing an agreement between the University of Dhaka, and India's Council of Scientific and Industrial Research for joint research on oceanography of the Bay of Bengal during India's Prime Minister Narendra Modi's visit on 7 June this year. Moreover, the European Union earlier also showed interest to work with Bangladesh in this area. Maritime cooperation, in the form of bilateral collaboration has been in practice since long. The formation of Indian Ocean Naval Symposium (IONS) was such a milestone event in the field of maritime cooperation event. IONS now includes 36 member countries and bringing all littorals of the Indian Ocean under one umbrella is a great achievement by itself. IONS charter describes one of its objectives is to establish a variety of multinational maritime cooperative mechanisms designed to mitigate maritime security concerns among members. Bangladesh Navy is participating in all the activities of IONS to promote regional maritime cooperation and getting ready to chair this large regional maritime association from 2016. Besides, Bangladesh is actively involved in the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia, (ReCAAP) which is a multilateral agreement between 16 countries in Asia, Western Pacific Naval Symposium (WPNS) to exchange ideas and agree upon procedures affecting maritime conduct at sea among 22 member states where Bangladesh Navy participates as Observer.

Conclusion

Regarding the Blue Ocean economy, the sea is still unfathomable. However, we can say that Bangladesh has got her second economic hub after resolving the long standing maritime issues with her neighbours. For exploration of huge sea resources, the highest bodies of the government has already taken this issue into priority list. Besides, the government and the policy makers today have begun to emphasize the importance of the maritime security in the economic uplift of the country in the context of poverty alleviation, ensuring food and nutrition security, combating climate change and its impact.

Today, the government has set out the vision regarding the Blue Economy as one of the most potential sectors for the overall national economic interest. Therefore, to achieve all these, the primal task is to formulate pragmatic policies and roadmaps for achieving the benefits of the blue economy.

In addition, 93% of the Bangladesh's trade by volume is still carried out through the sea. Twenty-five years of the World Wide Web haven't made any less dependent on the sea — in fact, the opposite is true. Over 95% of all inter-continental digital and internet traffic travels not via satellites but through undersea fibre optic cables. So, the relationship is about defence and security at sea. It is where the maritime forces must work to prevent the pressures and challenges that arise from an increasingly complex and interconnected world from spilling over threats that have the potential to influence on nation's economy and environmental change, like piracy and people trafficking etc.

Today, the world isn't getting any safer and the sea is the frontline and more vulnerable than other space. So the Bangladesh Navy's task is to be ready for the threats and uncertainties ahead, but also to maximise our national advantage in this competitive age of global opportunity. But it's also important to ensure the maritime security at range to prevent problems before they reach our own shores. BN, in concert with other security and maritime stakeholders, has played, and continues to play, a vital role in contributing to the stability of the maritime sector, and keeping the waterways of Bangladesh open and secure for the benefit of national trade, fisheries, and potential energy resources while preventing the same from the illegal intruders through aggressive posture in anti-piracy, human trafficking and anti-smuggling operations round the clock with however limited capability.

BN's economic role extends to engagement and diplomacy, often in support of the global peace and regional humanitarian and disaster assistance. Besides physically protecting trade and patrolling shipping lanes, the BN ships and crafts deployed in Mediterranean and a good number of African countries under UN mandate speaks about the nation's intent, capability and contribution in the global stage. Thus Bangladesh Navy acts as true ambassador for the country in far flung corners of the world; an instrument of our national ambition, quietly underlining our military and economic credibility, subtly reinforcing the prestige of not just the service, but also the nation as a whole.

As the economic growth continues, Bangladesh is growing in confidence, ambition and prosperity — and through the investment in maritime security by acquiring new ships, aircraft and submarines. This country is on track of building a credible Navy to match the role and task in support of safeguarding national interest at sea. Today, it has become a national agenda of Bangladesh to build strong and credible maritime force which meets the national aspiration as well as can influence in regional and global security. In the maritime sector, all the agencies and parties need to continue to work together: working in partnership and sharing information at sea, seeking solutions ashore through integration, policy formulation and resource sharing

and prioritizing the issues of maritime sector. So, the relationship between Bangladesh Navy and Bangladesh's maritime sector has never been closer, or more important, than in this age of strategic opportunity to pursue Blue Economy for the country.

Commodore M Musa (G), NPP, rcds, afwc, psc, BN, was commissioned in Bangladesh Navy on 01 July 1987 after receiving his basic training from Royal Malaysian Navy. He did Missile Officer Course from China in 1992 and Specialisation in Naval Gunnery from Pakistan in 1995. He performed as Chief Instructors at Naval Gunnery and Seamanship Schools. He commanded 6 (six) warships ranging from Patrol craft to Frigate. He has in his credit four Master's Degree in War studies, English Literature, International Security and Strategic Studies & Business Administration. Commodore Musa completed Naval Staff Course from Mirpur and did 2nd Staff course from France. He is also a graduate in Armed Forces War Course from NDC. He performed Staff Officer's duties at Naval Headquarters in Plans Directorate, Naval Secretariate and served as UN Military Observer in Ivory Coast. The Commodore successfully completed the Royal College of Defence Studies (RCDS) course in UK from 2013 to 2014 and also passed MA in International Security and Strategy from Kings College, London. Commodore Musa is currently appointed as Director of Naval Plans at Naval Headquarters.

AIR SPACE MANAGEMENT OF BANGLADESH : CHALLENGES AND PROSPECTS IN BECOMING A MIDDLE INCOME COUNTRY

Group Captain Md Mamunur Rashid, afwc, psc, ADWC

Introduction

Sovereignty over 1,18,813 sq km Exclusive Economic Zone (EEZ) in maritime boundary especially over the Bay of Bengal has been established by Bangladesh through the arbitration of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) on 14 March 2012 with Myanmar and on 7 July 2014 with India. Through this arbitration, the airspace of Bangladesh has been expanded horizontally by 1,18,813 Sq km from the coast. Geographical position of Bangladesh gives geo-economic importance to Bangladesh because it connects Asia Pacific Countries with South Asia, Middle East, Europe and Africa. It plays as an air space bridging point in the region. The total airspace of Bangladesh is 2,62,811 sq km through which approximately 500 reported aircraft overfly, arrive and depart everyday but Bangladesh has not developed enough capacity to manage this space. Because of the lack of technology in place and infrastructure in the coastal region, Bangladesh cannot monitor or maintain record of all aircrafts overfly over the maritime boundary to charge fees for using our air space. That is why we are losing a great deal of money in the form of revenue everyday which could contribute immensely to our GDP growth. This is going to be a new avenue for Bangladesh to explore and exploit without any delay.

The operation of number of international and domestic airlines over Bangladesh is increasing significantly and they operate in both domestic and international routes. Though Cox's Bazar Airport came into operation lately, but it has earned highest among all domestic airports. The growth of passenger and cargo movement by air has increased manifold. Any airlines either operating over Bangladesh airspace or operating from any of the airfields has to pay different service charges to Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB). These charges are good in comparison to other means of transportation. This revenue is charged for using aeronautical and non-aeronautical aids. Biman Bangladesh Airlines (BB), the national career, had been earning profit in 2007-9. BB provides all ground support facility at Shah Jalal International Airport (HSIA). If we can increase navigation, communication, surveillance and search and rescue (SAR) facilities, especially over delimited maritime boundary, we can earn quantum revenues from there, which could contribute immensely in our economy.

Moreover, expansion in the south would increase job employment opportunity for aviation professionals. Airspace management (ASM) can contribute greatly in socio-economic development (SED) of Bangladesh in future.

ASM

ASM is the coordination, integration, and regulation of the use of airspace to ensure smooth and safe flow of air-traffic within the defined airspace[1]. ASM is the process by which airspace options are selected and applied to meet the need of all airspace users.[2] ASM in every country is aimed at optimising maximum utilisation of the given airspace and maintaining safe and orderly flow of air traffic during all phases of operation. ASM consists of a ground component and air component, both of which must be closely integrated through well-defined procedures. Bangladesh government has delegated the responsibility of ASM to CAAB.

CAAB functions as the regulatory body for all aviation related activities in Bangladesh. It also provides the aeronautical services and is responsible for safe, expeditious and efficient flow of air traffic within the Flight Information Region (FIR) bounded by the geographic boundary of Bangladesh. This organisation is the custodian of all civil airfields and allied facilities including air navigation facilities. Aviation activities in Bangladesh started in the last week of December 1971. Over the years, the infrastructure and facilities were developed. At present, aviation activities are being carried out from three international, seven domestic and five Short Take-off and Landing (STOL) airports, about 46 airlines are now operating in and out of the country; about 51 states signed bilateral agreements with Bangladesh.[3] At the same time, Bangladesh Air Force (BAF) is responsible to take necessary measures against any air space violation. CAAB is committed to International Civil Aviation Organisation (ICAO) to apply their standards and practices while formulating the rules and procedures. The consideration for benchmarking ASM is:

- Number of civil air operators (national and international) and their need.
- Intensity of military operation and their need.
- Type of traffic involved.
- Number of traffic affecting an airport and an air space at a particular period of time.
- Some other relevant factors as deemed necessary by the state.[4]

Demarcation of Bangladesh Air Space

Bangladesh is bounded in west, north and east by India, southeast by Myanmar, and south by Bay of Bengal. The airspace of Bangladesh is horizontally above the land area of Bangladesh and territorial water. The territorial water of Bangladesh is 12 nm from the coast line and is vertically

1 http://encyclopedia.thefreedictionary.com/airspace+management

2 ICAO definition – ICAO Cir 330

3 10th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 2.

4 "Peace Time Air Space Management of Bangladesh", Squadron Leader (now Group Captain) Md. Mamunur Rashid, 1997, Page-3.

extended up to 100 km.[5] EEZ, which is 200 nm extended towards the Bay of Bengal. According to the verdict of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) of United Nations (UN), Bangladesh is awarded with 1,18,813 sq km,[6] which is approximately 81% of our land area.[7] Air Traffic Services (ATS) of different types are provided for the entire airspace including over the territorial waters of Bangladesh as well as in the airspace over the high seas encompassed by Dhaka FIR (under Dhaka FIC) except that portion which has been delegated to Calcutta FIC for provision of Air Traffic Services (Route L-507 from 26,000 to 40,000 feet ATS is provided by Calcutta FIR). Airspace may be further subdivided into a variety of areas and zones, including those where there are either restrictions or complete prohibition of flying activities. We have one Terminal Control Area in Dhaka and two in Chittagong and Dhaka. We have 14 domestic Aerodromes, 17 Restricted Areas, 16 Danger Areas and two Prohibited Areas in our airspace. Restricted Areas are mostly earmarked for BAF aircraft to operate their training missions. Danger Areas are used by Bangladesh Army, Bangladesh Navy and Bangladesh Air Force for firepower practice. We have 15 Domestic Routes and 10 International Routes over our airspace.[8] We need to establish Oceania Area Control in Chittagong covering the demarcated EEZ of Bangladesh. The demarcation of Bangladesh Airspace both horizontally (only over the Maritime Boundary) and vertically are shown below.

DEMARCATION OF BANGLADESH AIRSPACE

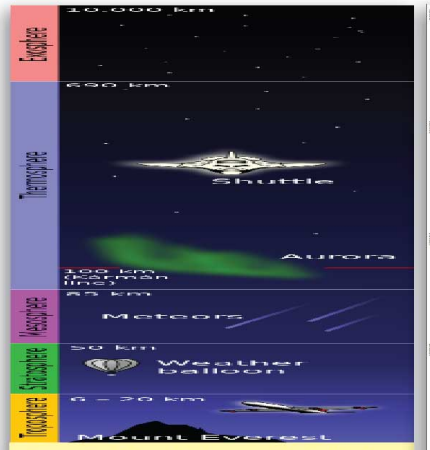

Figure 1: National Airspace (Vertical) along with Layers of Atmosphere showing Karman Line (not to scale)

Map 1: Demarcation of Bangladesh Airspace over Maritime Boundary

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Airspace (TheFédération Aéronautique Internationale has established the Kármán line, at an altitude of 100 km (62 mi), as the boundary between the Earth's atmosphere and the outer space, while the United States considers anyone who has flown above 50 miles (80 km) to be an astronaut).

6 "Bangladesh's Maritime Boundary", Current Affairs, August 2014, "Verdict from the Permanent Court of Arbitration", M. Inamul Haque, The Daily Star, 10 July 2014"Bangladesh's Maritime Boundary", Current Affairs, August 2014.

7"Bangladesh's Maritime Boundary, Prospect and Challenges", Presentation given by Commodore Mohammad Khurshed Alam (C), ndc, psc, BN (Retd), BPATC, March 2015.

8 AIP, Bangladesh, CAAB.

Traffic Intensity over Bangladesh Air Space

Bangladesh constitutes a vital part of international and regional air traffic routes. Many south and south-east countries connect their air routes to the west through Bangladesh Air Space and vice versa. India takes transit while connecting its Eastern States with the rest of the states. Bangladesh has its own traffic too. It consists of international and domestic ones. Calculation shows that about 300 aircraft overfly over Bangladesh and 200 aircraft takes off and land every day from domestic airport.[9] Presently, 26 foreign airlines are operating in Bangladesh as per the bilateral Air Service Agreement (ASA). Forecasted growth of Boeing Aircraft Manufacturing Company is shown in the chart below.[10] Asia Pacific Region is going to have highest GDP growth in future. This will affect positively in aviation sector and in our economy as well.

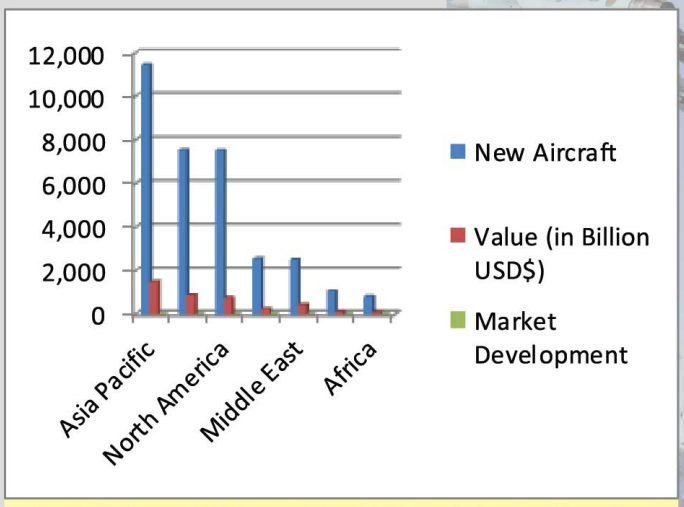

Chart 1: Growth of Boeing Aircraft Manufacturing Company

International and Domestic Passengers Movement. At present Aviation Sector of Bangladesh handles 59 lakh passengers in a year. The average growth in the international and domestic passengers' movement in Bangladesh is 8.08%.[11] Biman Bangladesh Airlines (BB) carry around 35% of the total passengers and the rest 65% are being carried by foreign and local private airlines.[12] Though the passenger carrying capacity by Bangladeshi airlines increased, the major share of passengers are travelling through foreign airlines. Increase numbers of their flights to and from Bangladesh manifest this. From the above statistics and analysis, it is well understood that the capacity of the Bangladeshi airlines needs to be increased in all respect to cope up with the rapid growth in the movement of the international and domestic passengers. The year-wise international and domestic passengers' growth from 2006 to 2013 is shown in the chart below:

Chart 2: International and Domestic Passenger Growth in Bangladesh

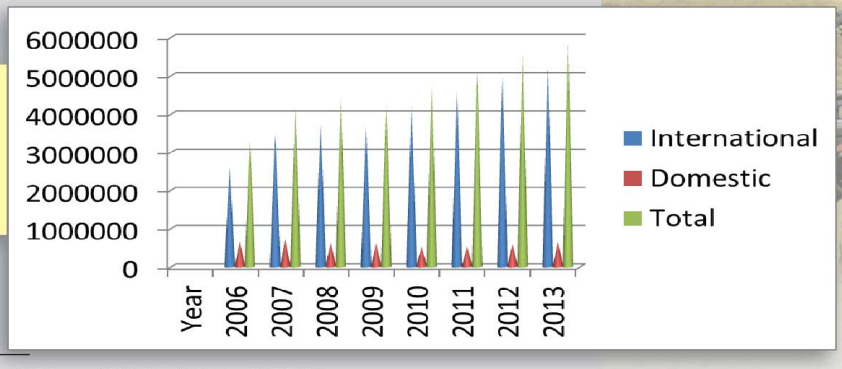

9 Sqn Ldr Ramzan and Sqn Ldr Rafique, interviewed on 25 February 2015, Duty Controller, ADOC, BAF

10 Boeing Current Market Outlook 2011-2030.

11 10th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 5.

12 Syede Maria Hossain, "Internship Report on Discussion of Four P's of Biman Bangladesh Airlines", BRAC University, page-17.

Cargo Carrying Growth. At present Aviation Sector of Bangladesh handles 2,35,000 metric ton cargo in a year. In the domestic and international sector, the average growth of the air transportation of cargo was 10.04% starting from 2006.[13] This trend is likely to continue in future due to the growing international market for the Bangladeshi commodities especially in the Ready Made Garment (RMG), frozen food, leather, tea, vegetables etc, which are normally exported through air transportation. As such, Bangladesh has better prospects in the air transportation of cargo. To cope up with the growing need, the number of aircraft also needs to be increased. The cargo section of HSIA digitalised their cargo handling system through automation which has increased revenue, accountability and transparency, and reduced corruption. Cargo handling will increase revenue earning in future if more number of aircraft could be utilised in this field.

Revenue Earned by ASM and Its Impact on Economic Growth

Aviation is one of the significant worldwide transportation networks, which makes it essential for global business and tourism. It plays a vital role in facilitating economic growth. However, the main earning of any government is taxes and tariffs from its airports. In Bangladesh, the major earning comes from two ways — Aeronautical Charges and Non-Aeronautical Charges. The net income by CAAB from FY 2005-06 to 2012-13 (Taka crore) in terms of both aeronautical and non-aeronautical field[14] is shown in a graph below:

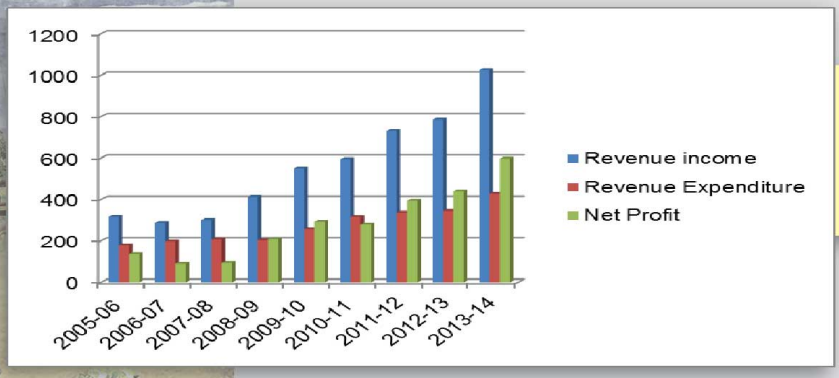

Chart 3: Net Revenue Profit Earned from ASM from 2005-2014

Chart 3 shows that in the last nine years, the revenue earning of Bangladesh government has increased significantly due to overall global market expansion as forecasted by different agencies. If this trend continues in the future, we will be able to earn a good amount of foreign currency from the sector. If we consider the revenue that CAAB earned through route navigation in 1997, it is found that one third was earned from only one route over the sea.[15] But we have another route (P-646) over the sea on which good

13 Mizanur Rahman, Member Finance, CAAB HQ, interviewed on 22 February 2015 and 10th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 5.

14 10th National Parliament Permanent Parliamentary Committee Meeting's Paper on Ministry of Civil Aviation and Tourism held on 15-05-2014, page 6.

15 "Peace Time Air Space Management of Bangladesh", Squadron Leader (now Group Captain) Md. Mamunur Rashid, 1997, Page-13.

number of traffic flies. But, neither CAAB provides navigational assistance nor we receive any revenue from the route. The navigational assistance could not be provided due to the absence of surveillance coverage through radar in the south, lack of two way communications, SAR facility and finally, no set policy and procedure has been laid down so far. Bangladesh can increase its revenue only from overflying aircraft over maritime boundary now. If Bangladesh can establish more five new routes over its maritime boundary, the revenue will contribute significantly on GDP growth. If Oceania Area Control Center is established, satellite or ground based surveillance radar is installed, VHF communication is established, SAR is ensured by BAF and BN and policy and procedure is prepared for controlling all overflying traffic over maritime boundary of Bangladesh, then the earning of revenue from route navigation would be enormous.

Our main challenge will be to grab the future opportunities and meanwhile create the suitable field for investment. If CAAB can meet the recommendation of Federal Aviation Authority (FAA), the western airlines would start operating in Bangladesh Airspace which would subsequently allow huge revenue from the aviation market. Moreover, Bangladesh has all the opportunity to grab the market of Bhutan and Nepal as both the countries are land-locked and do not have any sea port. Their most of the cargo transportation takes place through air, or by road through India. If we can do it effectively, air transportation market especially for cargo will expand in many fold, which in turn will enhance our national economy. This is a challenge that Bangladesh has to take for making aviation a front-runner in the growth of national economy.

Comparative Study on Revenue Earned by ASM

The amount of landing, parking, boarding bridge charges, airport charges and taxes by Bangladesh vis-a-vis other countries of the world and few Asian Countries have also been analyzed, which is shown in charts 4 and 5.[16] It is found that in Asia, Bangladesh charges lowest for international flights. Calculation shows that without doing much infrastructural

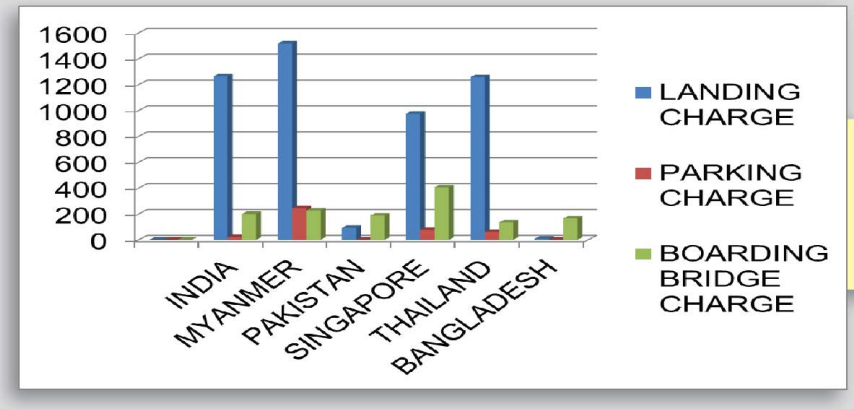

Chart 4: Comparison of charges among few Asian countries

16 ICAO Document 7100 (2012 Edition) and IATA/SITA Passenger Air Tariff System date July 2012.

development, it will contribute around 0.4% of total national GDP[17] (considering GDP of FY 2011-12), if we can charge proportionately. However, CAAB has also identified the low charge issue and reviewed the existing charges which will be implemented shortly.[18] At the same time, we must improve the quality of services and ensure implementation of prescribed safety procedures as laid down in different ICAO manuals. Moreover, Bangladesh may explore few other fields from where additional taxes can be charge. These additional fields of taxes will further enhance GDP growth.

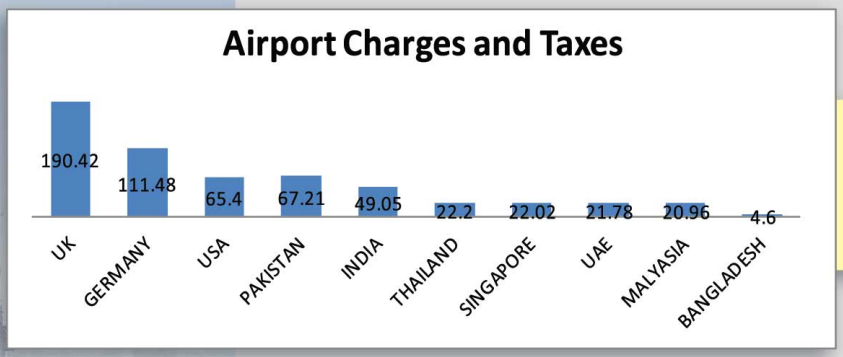

Chart 5: Comparison of airport charges and taxes imposed on international passengers

Bangladesh Becoming Middle Income Country (MIC)

To become MIC will require increasing of GDP growth to 7.5 to 8% per year based on accelerated export and remittance growth. Bangladesh has maintained an impressive track record on growth and development. In the past decade, the economy has grown at nearly 6% per year, and human development went hand-in-hand with the economic growth. Poverty dropped by nearly a third, coupled with increased life expectancy, literacy, and per capita Gross National Income (GNI), while the population growth rate has declined and the labor force is growing rapidly. This can be turned into a significant demographic dividend in the coming years, if more and better jobs can be created in the aviation sector for the growing number of job-seekers.

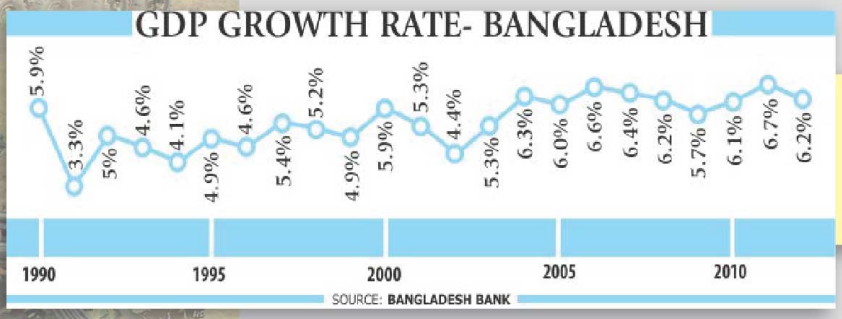

Chart 6: GDP growth rate of Bangladesh

Bangladesh has every potential to become a regional business hub. This opportunity can be utilised by focusing on the global connectivity growth. The connectivity growth will in turn enhance economic growth. Economic growth is usually associated with production growth, good governance, and in some cases technological changes also bring desired achievements. Based on

17Wing Commander Md Rafiqul Islam, ATC, "Air Space Management of Bangladesh", Essay Paper, BUP, 2014, Page-18.
18 Group Captain Nazmul Anam, Director of Flight Safety, CAAB, interviewed on 04 April 2015.

Vision-2021, the Perspective Plan (Sixth and Seventh Five Tear Plan from 2011-2015 and 2016-2020) has been formulated targeting Bangladesh to become a MIC[19] by 2021, when the country will celebrate its 50th year of independence. Bangladesh has successfully achieved most of the Millennium Development Goals (MDG) set by the UN and is on course for achieving the Sustainable Development Goals (SDG). In FY 2011-12, ASM contributed in the national economy of Bangladesh by increasing 0.08% of total GDP.[20] Though the present contribution is not that praiseworthy, but ASM will be able to contribute significantly in future by employing good number of people in this sector for increasing services and establishing new arena in getting more revenue.

Future Plan

Flight over Delineated Maritime Boundary. Number of air traffic operating over sea each day is far more than the number of traffic operates over the main land in case of Bangladesh. At present, CAAB has limited control over international route L-507 (FL 260 to FL400 controlled by Kolkata FIR) and no control over P-646 located over maritime boundary of Bangladesh. The GDP growth that we have now, would have quantum effect if we could provide services to those aircraft and get revenue from those. For that we need to establish Oceania Area Control Centre in Chittagong, establish two way communications with the aircraft, install surveillance radar for providing all kind of navigational assistance and finally gain capability for search and rescue facility, especially at sea. Bangladesh, India, Myanmar and Thailand (BIMT) come under ICAO Asia Pacific Regional Office located at Thailand. Initiative has been taken to increase more 10 routes in this region due to increase demand of air traffic out of which five routes will be over Bangladesh and all those routes will be located oven EEZ of Bangladesh.[21]

Increase in Numbers of International Airport. At present Bangladesh is having only three International Airports located in Dhaka, Chittagong and Sylhet. Considering the enormous potential in tourism sector, if we could upgrade or establish more four airports in Cox's Bazar, Saidpur, Khulna and Potuakhali, it would increase job opportunity, at the same time allow us to earn revenue. The contribution of domestic airport in earning revenue is shown in the chart below:

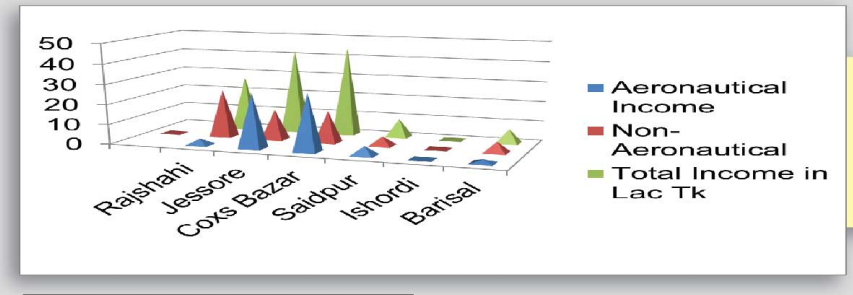

Chart 7: Comparative income chart of domestic airports of Bangladesh (Fy 2013-2014)

19 Middle-income countries (MICs) are one of the income categories that the World Bank uses to classify economies for operational and analytical purposes. A lower-MIC will have a per capita income between $1,045 and $4,125 and an upper-MIC needs to have a per capita income between $4,126 and $12,745 in FY 2015. The World Bank classifies every economy as low, middle or high income. The World Bank uses GNI per capita as the basis for this classification because it views GNI as a broad measure that is considered to be the single best indicator of economic capacity and progress. Low-income and middle-income economies are collectively referred to as developing economies,

http://www.worldbank.org/en/country/bangladesh

20 Wing Commander Md Rafiqul Islam, ATC, "Air Space Management of Bangladesh", Essay Paper, BUP, 2014, Page-18.

21 Md. Faizul Haque, Assistant Director, Directorate of ATS, CAAB, interviewed on 22 February 2015.

Earn by Flexible Use of Airspace (FUA). At present we have 17 Restricted Areas, and 16 Danger Areas earmarked for BAF flying and firing by three services respectively. Moreover, we have 10 international and 15 domestic routes over our airspace. Deviation from demarcated route even during bad weather becomes difficult because of no agreement signed or procedure let down between CAAB and BAF. If we could allow civil flying clubs and other domestic/international airlines to operate over those areas during no-flying by BAF and bad weather then BAF could charge money by providing navigational assistance in those areas which could contribute to the economy.

Establishment of Air Defence Identification Zone (ADIZ) over Bangladesh Airspace. ADIZ is extended beyond a country's airspace to give the country more time to respond to foreign and possibly hostile aircraft.[22] The authority to establish an ADIZ is not given by any international treaty nor prohibited by international law and is not regulated by any international body.[23] Bangladesh did not establish ADIZ till date. But, both our neighbours have established ADIZ over their airspace. Due to the absence of ADIZ, many international civil aircrafts crisscross our airspace without informing their position and intended route. Therefore, Bangladesh is losing revenue from those aircrafts. Out of 28 gas fields in deep sea of the Bay of Bengal, Bangladesh got legal ownership of 21 blocks.[24] Moreover, Over 90% of the planets' living and non-living resources are found within a few hundred kilometers of the coasts. More than 32 million people live in the coastal zone and another four million are directly involved with the sea fishing.[25] For protecting the enormous living and non-living wealth under the Bay of Bengal, BAF needs to have the capability to conduct surveillance over the whole airspace including maritime boundary and also needs to have the capability to intercept any aircraft violating her airspace. At present, BAF has the capability to enforce ADIZ. Air Defence Operation Center (ADOC) of BAF is responsible for detection, identification, threat evaluation, tactical action, and finally, the assessment of any traffic violating our airspace. BAF needs to take the initiative to implement ADIZ over our airspace for effective implementation of the Air Defence Clearance (ADC) procedure which already exists, so that any aircraft intends to fly in our air space takes ADC and fly over our air space with specific ADC number. The process would allow Bangladesh to ensure proper defence of our air space and to ensure all aircrafts to give revenue in future, thus contributing in our economy. Digital Interfacing through internet with ADOC with all concerned agencies is very much required for ADC.

---

22 www.en.wikipedia.org/wiki/Air_Defence_Identification_Zone. ADIZ is an airspace over land and water in which the identification, location and control of civil aircraft is required in the interest of national security

23 It is airspace of defined dimensions within which the ready identification, location and control of airborne vehicles are required Airspace Control, Theatre Airspace Management and Control Course, Fighter Controller Training Unit, BAF, March 2012, page-3-3.

24 Professor Dr. Md. Hossain Mansur, "Bangabondhu's Visions in the field of Energy and Government's Success",, The Daily Star, 09 August 2012.

25 "Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century", Commodore Mohammad Khurshed Alam (C), ndc, psc, BN (Retd), Pathak Shamabesh Bangladesh, 2004, Page-5.

26 Group Captain S M Nazmul Anam, psc, Director of Flight Safety, CAAB, interviewed on 04 April 2015 and Accounts Section, HSIA, CAAB, 06 April 2015 .

http://en.wikipedia.org/wiki/Biman_Bangladesh_Airlines.

Revive BB to a Profitable Organisation. BB, the national flag career of Bangladesh carries 35% of passengers and 25% of cargo of the country. Gulf and ME destinations contribute 32% of BB's total revenue earning. This organisation was profitable but due to wide range of corruption in purchase and lease, repair and maintenance, ticketing in out-stations, and tender process, it has become a losing concern for the government. BB also fell behind on millions of dollars in payments to its fuel supplier, the Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), with debts rose to Tk 15.64 billion in late December 2006. BB also has debts to CAAB of Tk 1138 crore approximately for aeronautical and other charges.[26] The airline made profits in FY 2007–08 (Tk 60 million) and FY 2008–09 (Tk 150 million); in FY 2009–10. However, the carrier incurred in a net loss of Tk 800 million.[27] BB could be made profitable if we could give the steering wheel to efficient management with strong aviation background who can establish accountability and transparency in financial aspect and justice in governance of the organisation.

Contribution of HSIA

According to establishment, 1391 people were approved to run HSIA. The establishment was reviewed and the proposal was given to increase manpower to 3500. HSIA contributes in SED of Bangladesh by employing professional people related to aviation. From this airport, from July 2014 to January 2015, total Tk 598 crore net income was collected by providing different kinds of aeronautical and non-aeronautical services, and this money directly contributes in the growth of the country's GDP.[28] HSIA is taken as benchmark and earns more than 10 times in revenue compare to other two international airports in Bangladesh. HSIA is upgrading its surveillance and communication system under Public Private Procurement project including automation which will increase the capability and revenue earning of HSIA in future. HSIA is in the process of establishing airport hotels for transit passengers and aircrews which will add the revenue earning as well. HSIA is striving hard to improve its infrastructure by making new Terminal Building-3, making parallel runway, connecting with Mass Rapid Transport (MRT) system, and also increase the length of runway for upgrading its category as per FAA recommendation, so that by 2018, all airlines of USA can operate from HSIA and it can handle 8 million passengers.[29]

Recommendations

Following recommendations are made:

- Potentials for increasing revenue through ASM over our maritime

28 Mohammad Anwar Hossain, Assistant Director, Accounts Directorate, HSIA, CAAB, Interviewed on 22 February 2015.

29 Group Captain M K Zakir Hassan, afwc, psc, Director HSIA, Interviewed on 22 February 2015.

boundary appear to be very high. To ascertain the actual viability, an intensive feasibility study is needed. For this, a Task Force may be formed.

- CAAB has to establish Oceania Area Control Centre in Chittagong with surveillance, communication, SAR facilities and take over the control of international route L-507 and P-646 completely. In addition, CAAB are to establish five new international routes over delimited maritime boundary in coordination with ICAO Asia Pacific Regional Office, Thailand. BAF is to establish ADIZ over Bangladesh Airspace and enforce ADIZ for air defence and pilferage of revenue earnings. CAAB and BAF are to coordinate in establishing FUA over Bangladesh Airspace.

- CAAB is to review aeronautical and non-aeronautical charges time to time keeping similarities with other countries in the world. Passenger and cargo-handling facility needs to be improved and other facilities such as hotel, golf course and country club are to be established in all international airports considering future need. CAAB needs to establish more international airports close to tourist areas in Bangladesh and increase employment for smooth functioning of ASM.

- To solve the growth of passenger travelling by air, CAAB needs to establish one new terminal building at HSIA. HSIA needs to increase runway length and construct parallel runway to upgrade the classification of the airport as per FAA recommendation, so that all western airlines can operate in Bangladesh.

- There is no task force formed between Ministry of Civil Aviation and Tourism (MCAT), CAAB and BAF to ascertain the viability of investment for ASM. New policy, procedure needs to be prepared and necessary amendments are to be given in Aviation Instruction publication (AIP) for safe and effective control of all traffic overflying the maritime boundary.

- All-out efforts must be taken to make BB as a profitable organisation.

Conclusion

ASM is an important sector of Bangladesh which has lot of potential in contributing in the economic development of the country. The opportunity of earning through ASM has increased tremendously due to delimitation of maritime boundary. CAAB is the regulatory body in peace time ASM and CAAB has to take initiative in establishing Oceania Area Control Centre for increasing surveillance, communication and SAR capability in the south of Bangladesh. As the growth of passenger and cargo is increasing day by day, we need to improve the airport facilities at HSIA and other international and domestic airports. New international airports are to be constructed or old

domestic airports are to be upgraded to international airport near the tourist areas. At the same time, facilities in all other airports are to be improved so that passenger and cargo services can be provided. Establishing ADIZ would also help in ensuring AD and reducing the loss in revenue earning.

CAAB has to increase aeronautical and non-aeronautical charges, so that revenue earned in this sector could be added to the GDP growth of the country. All facilities of the airport needs to be improved and other facilities such as hotel, golf course and country club are to be established in all international airports considering future need. CAAB needs to establish more international airports close to the tourist areas in Bangladesh and it also needs to increase employees for smooth functioning of ASM. If due importance is given in this sector by the government, ASM will contribute to a great deal in the socio-economic development of the country and lead the country to MIC.

Group Captain Md Mamunur Rashid afwc, psc, ADWC, was commissioned in the Bangladesh Air Force in January 1989. He has attained Master's Degree in Political Science and Defence Studies from National University and Master's Degree in Security Studies from Bangladesh University of Professionals. At present, he is Commanding BAF Radar Unit Moulavibazar. The writer is personally grateful to Dr Md Mahmudul Hasan, Economist, MDS, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar for guidance in writing the article.

UNTOLD SUCCESS OF BANGLADESH DIESEL PLANT

Brigadier General Asif Ahmed Ansari, afwc, psc

Introduction

Many of us do not know that our officers and men are deputed to some industrial and business outfits. It is worth mentioning that they are doing outstanding jobs there. There are many untold stories, and here I intend to highlight the activities of one of such commercial enterprises of Bangladesh Army.

Bangladesh Diesel Plant (BDP) Ltd. is a government owned organisation. Having been conceived in 1967, it started its journey after independence in 1980, under Bangladesh Steel and Engineering Corporation. At that time, it used to assemble the German origin Deutz Brand Diesel Engines. Hence, the nomenclature is Bangladesh Diesel Plant. The factory continued its production and business activities for next 20 years but could not become commercially viable and was closed in 2000 due to incurring heavy loss. On 30 May 2007, it was handed over to Bangladesh Army. After all these years, it again went on production and started its business transaction from June 2008 under Army management. You will be happy to know that, now, this plant has emerged as a profitable government industry through coordinated plan and sound management. Though it doesn't produce diesel engines anymore and yet to coup up with the market demand, it produces multidimensional engineering products. Now it is time to go ahead with developing capability of producing different products in the factory. Throughout-sourcing, limited production and assembling in the factory, BDP has made it economically solvent and in the process its manpower are trained and have become professionally more competent and productive. In the last seven years, BDP Ltd has made profit showing a very positive trend as shown in the following graph.

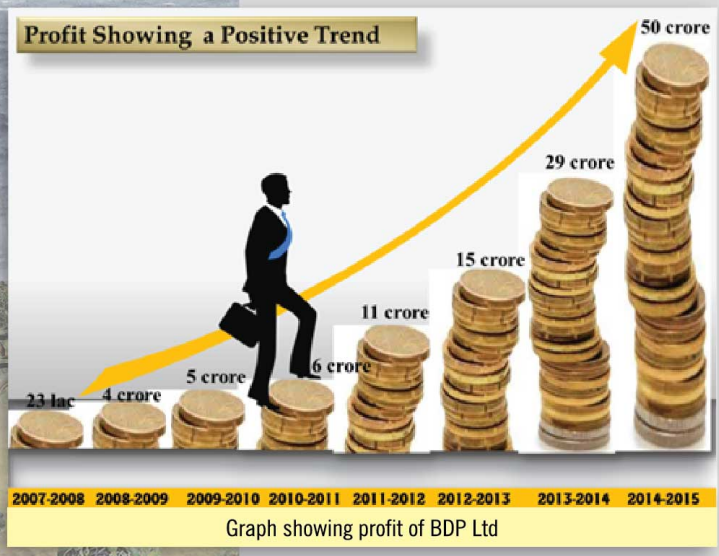

Graph showing profit of BDP Ltd

Flourishing Business Activities

BDP Ltd, in pursuance of its business expansion, is now manufacturing export oriented spare parts using quality raw materials, skilled manpower and

modern machineries. It has earned satisfaction of clients through manufacturing and supplying of different types of tools and spares for jute mills, feed mills, Bangladesh Ordnance Factories, grounding rods and B-type line hardware for REB, transformer structures for DPDC, solar structure and pipes of different diameters for dressing etc. Apart from these, BDP Ltd is capable of manufacturing many other spares of different machineries using its present infrastructure as per the demand of the valuable clients.

Directly Participating in National Development Efforts

BDP Ltd, apart from its factory activities, is massively involved in numerous nation building development works. Often the various ministries of the government prefer to give their national development responsibilities to BDP Ltd, as an Army organistion. They prefer to accomplish their challenging responsibilities following Direct Procuring Method (DPM) rather going for open tender method. Basing on the request of the ministries, BDP Ltd involves itself in multidimensional development works and procurement of the government. BDP Ltd has already earned good name by completing various projects in specified time frame and supplying quality goods to concerned ministries. It has successfully completed the projects related to construction, earth filling, supply and installation of engines, pumps of various capacities, generators and solar system etc to different government and non-government organizations adopting outsourcing means. Some of those are:

- Construction of Cold storage at Kurigram and Supply of engines, pumps, submersible pumps of various capacities to BADC for irrigation.
- Supply and installation of generators and submersible pumps for Dhaka WASA.
- Supply and installation of vertical turbine pumps at Goranchatbari, Construction of Loop cut at Kishorganj and Construction of a closure at Patakhali for BWDB.

Director, BDP Ltd for completing the Kalni-Kushiara Loop Cut Project at Kishorganj before the assigned time

- Installation of solar system for BGB at 165 BOPs and installation of 15.2 KW solar system at BN HQ.
- Installation of 1000 KW generator for BOF.
- Supply of generators and different kinds of tools to BRRI.
- Supply of Agriculture equipment for Department of Agricultural Extension.

- Construction of tower for Teletalk.
- Manufacture of transformer structure for BPDC.
- Earth filling,construction of internal road, Helipad and VVIP rest house for 1320 MW coal based thermal power plant at Rampal.
- Supplier of training aids to BMET.
- Generator Supply to COD for UN Mission.

Apart from all these completed projects presently BDP Ltd is involved in more than 40 nation building projects through outsourcing. Some mentionable ones are enumerated in subsequent paragraphs.

50 MW Power Generation Plant at Pagla, Narayanganj. This power plant started supplying about 50 MW Electricity to the national grid from 24 November 2010. Honorable Prime Minister inaugurated the power plant on 13 January 2011. The plant is fully operational now and it is adding uninterrupted electricity to the national grid. V-Power, a Hong Kong based company, is ensuring the operation and maintenance of the power plant. DPA Power Generation y Bangladesh Diesel Plant Ltd. (a state-owned company administered and managed by Bangladesh Army), Primordial Energy Ltd and Aggretech AG, Germany. Due to its outstanding performance in power generation Bangladesh Power Development Board (BPDP) has extended the contract for next five years (from 24 November 2013 to 23 November 2018) on completion of its initial three-year contract.

50 MW Power Generation Plant at Pagla Army Camp, Narayanganj

Musapur Closure Project. The tidal river 'Little Feni' of Noakhali district plays an important role in the region. During high tide saline water entering from sea through this river makes the vast land area barren. Asa result cultivation was adversely affected due to excessive salinity. Moreover, due to low pressure from upstream the salinity affected area was in the process of expanding farther north. The sweet water fishery is also badly affected due to salinity in the whole region.Considering the consequence, construction of a large closure along with a regulator near the sea shore area at Musapur was felt very important by Bangladesh Water Development Board. However, though a regulator (23-vent) was built, yet the closure could not be made after several repeated attempts by the concerned ministry. Finding no other alternative finally, the responsibility was handed over to Army. BDP Ltd took the challenge and could successfully complete the closure of 1080 meter and further development of the closer area is in progress. Now, if the closure

sustains, this will bring forth the following advantages:

- Salinity alleviation and mitigation of water logging of around 1, 30,000 hector land.
- Almost one fourth of the total project area will get irrigational facilities and thus play a pivotal role in additional crop production.
- Augment sweet water fish cultivation along 18 km length of 'Little Feni' river.
- Development of transport system, livelihood and other infrastructures.
- Scope of generating employment and source of income for the local people.
- Restricting river erosion and enhancing land reclamation.

Picture showing massive work is going on for the closure on Little Feni River at Musapur, Noakhali

Installation of Water Treatment Plant at KEPZ. Bangladesh EPZ is the only government organisation which assists all sectors to export their goods by which country earns a remarkable amount of foreign currency. Bangladesh Diesel Plant (BDP) Ltd is implementing a project of 'Installation, Testing and Commissioning of a Central Water Treatment Plant having capacity of 50 Lac GPD at Karnaphuly Export Processing Zone (KEPZ), North Potenga, Chittagong' to fulfill the demand of quality water by its stake holders.

Supply and Installation of 2G/3G Solar System. Bangladesh is pursuing to become a middle income country and to do so, it has to improve the condition of villages and connect them with the amenities of modern age. To provide them a gateway to information services and power, BDP Ltd is implementing projects related to Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2G/3G Solar System and internet connectivity with the financial support of Palli Daridro Bimochon Foundation (PDBF) in almost all the unions of Bangladesh. In the union service centres, where there is no electricity or during load shedding, the concerned people will get uninterrupted information service through internet connectivity. This project encourages use of renewable energy and thus it is environment friendly. It is also playing a vital role in building a Digital Bangladesh.

50 Lac GPD Water Treatment Plant at KEPZ, North Potenga, Chittagong

Picture showing handing over of Solar System and internet connectivity packageto Union Representatives

Pabna–Bera Pump House Project. Water management in relation to saving vast cultivable area from water logging during monsoon as well as making water available for irrigation during dry season is very important for attaining success in cultivation to achieve the production target. From this point of view, the installation of Pump House by BDP Ltd for Bangladesh Water Development Board at Pabna district (Gazner Bill Area) is of paramount importance. Once completed, it will have the following impact in the region:

- Improvement from single crop production to double and from double crop production to triple in the same year in 27000 hector land of Gazner Bill area.
- Providing irrigation facilities to 16000 hector land of Gazner Bill area.
- Fish cultivation in Gazner Bill during dry season.
- Unique submersible road in connection with this project to enhance transport facilities especially for marketing of crops.
- Enhancement of a forestation in the region.
- Enhancement dairy and poultry farming in connection with this project.

Picture showing massive work going on for the Pabna–Bera Pump House Project

Supply and Installation Pre-payment Metering System. BDP Ltd is implementing the pilot project of 'Supply, Installation, Testing and Commissioning of Pre-payment Electric Metering System' for Dhaka Power Distribution Company Ltd. Through this pilot project, the old post-payment billing system of electricity is being replaced by a new pre-payment system. This system is expected not only to reduce the sufferings of the consumers, but also to increase the earning of revenues of the Government. Moreover, it will also reduce the system loss of the electricity. Again, this system directly assists the consumers to be prudent in using electricity, which ultimately will reduce the load on national power grid. Thus implementation of this project will have a positive effect on overall GDP and also play a vital role to build a Digital Bangladesh.

1320 MW Rampal Power Plant. Generation of adequate electricity is the pre-requisite for the infrastructural development of a country. Without adequate power, development in industrial, agricultural, health and educational sectors is quite impossible. According to the Power System Master Plan (PSMP) — 2010 study, the peak demand would be about 10,283 MW in FY 2015 and 25,199 MW in 2025. The 1320 MW coal-fired Rampal Power Plant is a part of overall planning of the government to meet this forecasted demand and hence, it is one of the most important national projects.

MD, BDP Ltd addressing the inaugural ceremony of Pre-payment Electric Metering System

BDP Ltd is doing a remarkable job in preparing the enormous and critically located area ready for the construction of the main project to be accomplished by some foreign company with requisite know-how. As part of this overall project, BDP Ltd has already developed 420 acres of land along with necessary dyke, slope protection work and the boundary wall. Apart from those, a VVIP complex, three helipads, internal temporary roads are also constructed by BDP Ltd. At present, construction of pre-fabricated office complex and additional land development is going on.

This project will reduce the scarcity of power of the local area as well as of the whole country and create huge employment opportunity for both skilled and non-skilled manpower. Finally, on completion of this mega project, the economy of the country will get a considerable boost of which BDP Ltd will remain as a silent contributor.

Composite Bio-gas Plant at Military Farm, Lalmonirhat. The whole world is under a tremendous threat from 'Green House' effect and Bangladesh is not in an exception, rather, is more vulnerable to that effect. In this situation, reducing the use of fossil fuel and increasing the use of eco-friendly renewable energy is the need of the time. In this scenario, BDP Ltd is involved in a joint venture business of establishing a Bio-gas Plant at Military Farm in Lalmonirhat district. This project will have significant outcomes as followings:

MD, BDP Ltd inspecting the progress of Land Development work in 1320 MW Rampal Power Plant, Bagerhat

- Production of bio-energy as:
  - Bio-gas for households.
  - Electricity (Easy-bikes battery charging).

- Production of fertilizer as:
  - Organic fertilizer.
  - Balanced fertilizer (Organo-chemical).
  - Liquid fertilizer.

- Creating better waste management system for Military Farm at Lalmonirhat.

Exploring the Future

With the passage of time,as you know, the demand of diesel operated irrigation pumps and engines are fading out from the market. Now it is time to go ahead with developing capability of producing different products in the factory. To cope up with the versatile market demand BDP is exploring for multidimensional engineering, mechanical engineering, electro mechanical engineering and electrical products in the plant. BDP Ltd is pursuing the policy of making the factory more vibrant by involving itself in Joint venture projects at factory premises. In the process, it is establishing a Prepaid Electric Meter Assembling & Testing plant and a Concertina wire or Razor Barbed Wire production line in its factory area. In-sha-allah, it will be able to produce and market its own products and stabilise its financial base with all your supports. You will also be pleased to know that BDP Ltd is going to phase out most of the old machines and replacing those with new CNC machines for its future products. In the process, the name, mission, objectives, capabilities along with the organogram will also be changed as the production line of the factory is going to have a major positive shift.

Inaugural and agreement signing ceremony of Composite Bio-gas Plant at Military Farm, Lalmonirhat, Rangpur

Promotional Activities

BDP has also enhanced their promotional activities for marketing its products by establishing a show room, giving advertisement in the electronic and print media, furnishing stalls in ICT Fair and Dhaka International Trade Fair.

Corporate Social Responsibility

BDP is also involved in many nation building benevolent jobs under

Corporate Social Responsibility. Its objective is not to make monitory profit only. Here I like to quote Henry Ford (An American industrialist, the founder of the Ford Motor Company) 'A business that makes nothing but money is a poor business.' BDP gives more importance to nation building and development works. As social corporate responsibility, BDP is contributing to upbringing of autistic babies, Andhakallyan Sametee for blind handicaps, education of children in under — developed areas in Bandarban, Sylhet and Gazipur, development of Cancer Hospital and a Daycare Centre for working ladies at Dhaka Cantonment. It has also taken an endeavor to support national housing scheme and Trust Transport Services of Bangladesh Army. Besides business expansion, BDP is very much concerned about its employee's rights and privileges. Presently, it is providing an international living standard with all associated facilities to its labourers.

Conclusion

BDP Ltd., though not known much in the Army yet it has now become a very credible business entity in the business spectrum of Bangladesh. Army took over the plant with a burden of old and damaged engines with tk 74 crore deficits. From a closed, failure, unproductive and abandoned plant it has now become a profitable one. Presently, it has no deficit or loan rather it has become a recognised tax payer industry of the country.It has been possible due to the prudent management of Bangladesh Army. You will be surprised to know that, only seven Officers and two Other Ranks are deputed to this organization from the Army to look after the management. BDP Ltd expects to play a vital role in nation-building activities keeping pace with the national vision and Millennium Development Goal. Many government and private-owned business organisations have expressed their interest in BDP's various products and spare parts that have encouraged and motivated the industry. BDP is grateful to them and convey its gratitude to all its partners and clients. The outsourced projectsunder taken by BDP Ltd will have an immense effect on the overall development of the country. Ultimately these will lead to the enhancement of the GDP and play a vital role in the national economy. The positive contributions of BDP Ltd may be taken as an example by similar business institutes of the country to enhance the nation building efforts.

Brigadier General Asif Ahmed Ansari, afwc, psc was commissioned in the corps of Inf in 1986. He attended a good number of trg courses at home and abroad. He is a Graduate from the NDC and DSCSC. He holds MDS degree from the National University and MWS degree from BUP. He is also a diploma holder of Def Int Agency, USA. He is a Para Trooper and has Jungle Warfare Trg from Malaysia. He received both CAS Firing Trophy and IGP Trophy as Best Firer in Small Arms. He has served in various Comd, Staff and Instructional appts. The mentionable ones are; CO 21 EB and RAB-1, Dir Int RAB Forces, Instr Trg Eval, ARTDOC, Dir Admin, MIST, Instr in SMI and SI&T. He served in the UN peace keeping mission as an Ops Offr in Mozambique (ONUMOZ) and Chief Ops Offr in Sudan (UNMIS). He is a widely travelled person and visited more than 30 countries of 4 continents. Brig Gen Asif received the President's Police Medal (Seba) in 2007 for his outstanding service in Counter Terrorism effort in Bangladesh while serving as Dir Int in RAB HQ. Presently, he is serving as the Managing Director, Bangladesh Diesel Plant Ltd.

FEATURES HELPING BANGLADESH TO BECOME TOP RANKING TROOP CONTRIBUTING COUNTRY IN GLOBAL PEACEKEEPING AND CORRESPONDING CHALLENGES

Lieutenant Colonel Ali Reza Mohammad Ashaduzzaman, psc, Arty

'Bangladesh is a model member of the UN, providing leadership amongst the least developed countries… and contributing substantially to peacekeeping and humanitarian operations'

- Kofi Annan, UN Secretary-General

Introduction

History of Bangladesh Army's participation in UN peacekeeping missions is magnificent. Since long, Bangladesh has been consistently ranked as one of the top-most troop contributing countries in UN peacekeeping operations. The professional standing of Bangladesh in peacekeeping arena is profoundly admired by the world community. It started the peacekeeping journey in the year 1988 with contribution in Iraq under UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group). So far 1,35,384 peacekeepers from Bangladesh have participated in UN peacekeeping missions in 40 different countries. At present, 9,562 peacekeepers from Bangladesh armed forces and police are engaged in peacekeeping missions. Besides these deployments, Bangladesh has Peacekeeping Capability Readiness System to respond to any further call from UN to be deployed anywhere around the globe for the purpose of peace keeping.

Bangladeshi peace keepers have always shown gallant approach in time of need. With the deepest compassion it may be mentioned that till today 125 gallant peacekeepers of Bangladesh have sacrificed their lives for the cause of global peace. These esteemed sacrifices have strengthened Bangladesh's commitment towards the world peace. In addition to the list of sacrifices, 191 valiant peacekeepers have sustained injury for the cause of peace in the world under UN umbrella.

With this backdrop this paper intends to highlight the factors that helped Bangladesh to become a top ranking troop contributing country in UN peacekeeping missions. An endeavour will also be made to figure out the future challenges to hold this position and possible measures to overcome the challenges.

Inspiration of Bangladesh for UN Peacekeeping Missions

Many may wonder why Bangladesh is sending its troops and equipment in UN peacekeeping missions in other countries. The answer is clear — to uphold humanity. Bangladesh was born through an armed

struggle. It had experienced extensive sufferings and sacrificed a lot to achieve the independence. It understands the anguish of war. That is why Bangladesh always raises its voice against inhumanity and stands beside the sufferers.

Obviously, Bangladesh never participates in any aggression to other countries. Bangladesh is a peace loving country. Its constitution says '....We may prosper in freedom and may make our full contribution towards international peace and cooperation in keeping with the progressive aspirations of mankind…' In addition to the spirit of peace, the inspirations for Bangladesh for joining in peacekeeping missions are manifold.

Satisfaction for Working for the Peace and Humanity. Being a peace loving country, Bangladesh is committed for the peace and humanity. Bangladesh feels proud and satisfied working for humanity. This honest spirit makes Bangladesh to respond to the call of UN for peace and humanity.

Image Building. Bangladesh has already developed a very good image among the world community being a proud peacekeeper under UN. The trustworthy image helps in branding Bangladesh.

Earning Credibility. Bangladesh has already established its credibility for maintaining sincerity in peacekeeping efforts. That is why Bangladesh is always called upon by UN when there is a need of peacekeeping forces. Bangladesh considers itself privileged being a credible troop contributing county in UN peacekeeping missions.

Implementation of Training. Bangladesh Armed Forces and Police are highly trained in their profession. They keep continuing their training and exercise throughout the year to improve their standard further. Participation in UN peacekeeping missions gives Bangladesh Armed Forces and Police opportunities of on-the-ground implementation of professional training.

Invaluable Experience. Peacekeeping assignment is very challenging. Active participation and successful completion of those assignments provide Bangladeshi peacekeepers an invaluable experience of working in the international environment. Such multinational exposure helps them to gain operational expertise and knowledge of the latest dogmas and improve their own professional skills.

Exposure to Newer and More Sophisticated Technologies. By participating in UN peacekeeping missions, Bangladeshi peacekeepers get better exposure to newer and more sophisticated technologies. It allows Bangladeshi peacekeepers to know better the armed forces of other countries too.

Developing Friendship. The commitment of our peacekeepers has helped to gain credibility in the international environment by dint of which all countries of the world consider Bangladesh a good friend. It ultimately helps Bangladesh to develop strong diplomatic relations with other countries.

Reimbursement. Through participation in UN Peacekeeping missions

Bangladesh earns a handsome amount of foreign currency which ultimately adds to its GDP.

Features Helping Bangladesh to Become Top Ranking Country in UN Peacekeeping

The reasons behind the success of Bangladesh in Peace Keeping Operations (PKO) under UN are strict selection policy, discipline, professionalism, absolute neutrality, adherence to the UN mandate, principle of 'fair practice', and respectful relation with host nation. Quick adaptation capability of Bangladeshi peacekeepers to the changing PKO environment especially in the case of protection of civilians, assistance to host nation for capacity building and partnership in peace building add to the credibility in the contemporary conflict scenario.

There are numerous features that helped Bangladesh to build the image and ascend the top position of troop contributing. Some of such features are highlighted below.

Commitment in Maintaining World Peace. Bangladesh is committed to uphold the UN charter, the peaceful settlement of international disputes and the maintenance of global peace and security. Moreover, deep engagement with global peace under UN is firmly pronounced in the constitution of Bangladesh.

State Policy and Diplomacy. Bangladesh maintains the foreign policy 'Friendship to all and malice to none'. It pursues a policy of active participation in global as well as regional peace processes. Bangladesh is thus committed in maintaining international peace and security by multilateral means. In terms of diplomacy and foreign affairs, the performance of Bangladeshi peacekeepers has strengthened the country's international reputation.

Adherence to the UN Mandate. Bangladeshi peacekeepers always adhere to the UN mandate and keep going accordingly being deployed on ground. When assigned, Bangladeshi peacekeepers keep maintaining the objective to establish a sustainable peace therein. Bangladeshi peacekeepers' contribution in joint operations against armed miscreants in DR Congo and the dynamic role to cease fighting between two rebel groups in Mali are splendid examples of adherence to UN Mandates.

Professional Approach. Bangladeshi peacekeepers maintain professional righteousness throughout in any foreign assignment. This professional approach is well admired by the world community and accepted by the host country. Wherever deployed Bangladeshi peacekeepers have completed their assignments very professionally.

Maintenance of Trained Forces. Bangladesh always maintains trained forces. Forces those are yet to be deployed for any assignment keep undergoing training to remain fit and prepared. Formation training conducted

round-the-year helps Bangladesh to maintain well trained forces for peacekeeping assignments. Training arranged by Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training (BIPSOT) adds professional excellence to the training standard of Bangladeshi peacekeepers.

Sense of Duty. Strong sense of duty of Bangladeshi peacekeepers has made it easier to be more successful in peacekeeping assignment. Bangladeshi peacekeepers have never retreated in the face of danger when confronted with unknown enemies on a foreign soil.

Team Spirit. Team spirit of Bangladeshi peacekeepers is praiseworthy indeed. It helps to adopt any situation and complete the assignment in the foreign countries.

Transparent Selection Procedure. While selecting peacekeepers to be employed in global peace Bangladesh takes extra care. Only suitable peacekeepers are selected for the overseas assignments.

Experience of Hill Tracts. Bangladesh has an experience of fighting insurgents in hill tracts and bringing peace therein. This experience is very effective to employ while assigned in tasks of this nature.

People Friendly Attitude. Bangladesh peacekeepers are peoples' friendly. They mix up easily with local population despite language and cultural barriers. They understand peoples' problems, need, sentiment which play a vital role in the context of protection of civilian related tasks.

Maintenance of Principle of Fair Practice and Respectful Relation with Host Nation. Bangladeshi peacekeepers always maintain the principle of Fair practice and respectful relation with host nation. It helps Bangladeshi peacekeepers to go very closer to the people of the host nation so as to understand the root causes of the problem and find the probable ways to speed up the peace process.

Honest Spirit. Bangladeshi peacekeepers never pursue any hidden agenda. Bangladesh believes in uncontroversial contribution. Bangladesh never sends troops into conflict situations or into circumstances where they might look like aggressors.

Synchronized Civil-Military Cooperation (CIMIC) Activities. Bangladeshi peacekeepers always maintain an especial attention towards CIMIC activities. Building schools in Sierra Leone and Liberia, constructions of roads and bridges in South Sudan, and medical outreach programmes in Cote d'Ivoire under peacekeeping missions are glaring examples of it. These helped to a great extent to win the heart and mind of the local people and speed up the peace process. It is mentionworthy that Sierra Leone has declared Bangla as one their official languages. One of the roads in Liberia has been named as Bangla road. These, altogether, bears the testimony of sincere dedication of Bangladeshi peacekeepers.

Quick Adaptation to the Changing PKO Environment. Bangladeshi peacekeepers are trained for quick adaptation to the changing peacekeeping operational environment of peacekeeping. Bangladeshi

peacekeepers have walked from European winter to the hot-humid weather of East Asia and arid deserts of Sahara. Everywhere they had their glorious contribution. In the contemporary missions, Bangladeshi peace keepers are doing equally good in the rugged terrain of Darfur (Sudan) and extreme weather condition of Mali.

Sense of Pride in Participation of Peace Effort. Bangladesh takes pride in participating in the global peace effort. It always aspires to take a lead in the effort of establishing peace and humanity.

Maintenance of Well Disciplined Forces. Bangladesh never compromises with the discipline of the troops. It takes very strict and quick action against one if he/she violates discipline. Bangladesh shows no tolerance against any indiscipline deed.

Guard against Sexual Exploitation and Abuse (SEA) Cases. Bangladesh maintains 'zero-tolerance' policy and strong stand against SEA cases. A quick and reliable complaint mechanism is developed between the contingents deployed in mission and services' Headquarters in Bangladesh so that any SEA case is reported immediately and dealt with seriously.

Challenges to Hold the Top Ranking Position

Although Bangladesh is a leading troop contributing country in UN Peacekeeping missions, it may face challenges in future to hold this position as many other countries are also aspiring to take this position. Obviously, it is encouraging that many countries are coming ahead for the cause of humanity. Bangladesh as a peace-loving country should continue keep holding the top position. To hold this top position, upcoming challenges may be as enumerated below.

Competitive Environment. Many of the rich countries are coming forward to participate in PKO. So, future participation in UN missions may be more competitive than now.

Asymmetric Threat in the Peacekeeping Missions. Asymmetric threat in the mission areas have increased. It poses threat to life and equipment. Improvised Explosive Device (IED) threat coupled with suicidal vehicle borne attack in Mali, miscreants' attack threat in the Central African Republic (CAR), rebels' attack threat in Darfur (Sudan) are few of the examples. The threats on peacekeepers and their equipment are on rise in the war-torn areas.

Not Having High-level Representation in UN Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO) and Field Mission. Although Bangladesh is the top-most troop contributing country at present, it does not have adequate representation in UNDPKO and field missions. Obviously, Bangladesh deserves high level posts in UNDPKO and field missions. At this moment, Bangladesh has only one Deputy Force Commander (DFC), two Sector Commanders and some P4 level officers in DPKO which are very meager as regards to its contribution in peacekeeping.

Possible Measures to Overcome the Challenges

In order to withstand the challenges as mentioned above some measures as discussed below may be taken to continue participation of Bangladesh as top troop contributing country.

Equipping Peacekeepers More Efficiently. Peacekeepers may be equipped more efficiently. If the peacekeepers are equipped with new equipment including Counter-IED (CIED) Suits, Tactical Unmanned Air vehicles (UAV), Ground Surveillance Radar, Mine Protected Vehicles (MPV) and Mine Resistant Ambush Protected (MRAP), they will be safer and be able to pose robust in peacekeeping.

Enhancing Capability of BIPSOT. Infrastructure and capability of BISOT may be increased further. More number of peacekeepers from Armed Forces and Police may be sent regularly to BIPSOT for pre- deployment training.

Counter IED (CIED) and Counter Terrorism Training. CIED and Counter Terrorism Training may be given further emphasis in all military training institutions.

UN Mine Action Service (UNMAS) Training. More number of anti-mine and CIED training may be conducted at formation level in coordination with UNMAS.

Peace Building Centre. Bangladesh may establish a peace building Centre.

Maintaining Ties with Various Regional Cooperation Groups. Strong ties may be maintained with various regional organisations especially with African Union (AU) that will increase the acceptance of Bangladeshi peacekeepers especially in African Countries.

Diplomatic Effort to Get More Important Posts in UNDPKO and Field Missions. Strong diplomatic effort may be taken to get some more important posts at UNDPKO and field missions which will assist to get opportunities to contribute more as troop contributing country.

Conclusion

Bangladesh being a peace loving country always remains ready to stand beside the distressed people. Bangladesh always reiterates its commitment to adhere to the United Nations' mandate impartially and respects for human rights with utmost sincerity. Its mission for excellence and determination for upholding the values of peace and security remain firm.

Bangladeshi peacekeepers have walked a long way for the cause of world humanity and peace. It has already achieved glory and admiration world wide. It is now time to aspire to keep holding this position and making endeavour to reach a further height by its contribution for the cause of world peace. The ultimate sacrifice of Bangladeshi valiant peacekeepers continues to remain as the source of inspiration and strength for the total commitment to global peace. Taking the spirit of the glory already achieved, Bangladesh

Armed Forces and Police should continue to work closely with the United Nations to make their further contribution to promote peace around the globe.

BIBLIOGRAPHY

Books

1. United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, UNDPKO and UNDFS, 2008
2. The UN DPKO/ and DFS Civil Affairs Handbook, USA, 2012

Journals

3. GIGI Papers, No 2, April 2012

Websites

4. http://www.dandc.eu/en/article/why-bangladesh-sends-troops-un-missions-and-how-world-benefits-such-engagement
5. https://www.quora.com/United-Nations/Why-do-majority-of-the-UN-peacekeeping-troops-come-from-less-developed-countries
6. http://www.bdhcdelhi.org/index.php/Bangladesh-un-peacekeeping-force
7. http://www.biiss.org/seminar_2010/papers/ilyas.pdf
8. http://www.risingbd.com/english/Intl-Peacekeepers-Day-today/25217
9. http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-bangladesh/
10. http://www.norway.org/News_and_events/Embassy/Necessary-Strengthening-of-UN-Peacekeeping-Operations/#.VeFDfkY_--0
11. http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/publications.shtml
12. http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/global_contribution.shtml
13. http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
14. http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/backgroundnote.pdf

Lieutenant Colonel Ali Reza Mohammad Ashaduzzaman, psc, was commissioned in the corps of Artillery in the year of 1992. Besides serving in different appointments in artillery regiments, he commanded an artillery regiment. He served in Military Training Directorate, AHQ and School of Military intelligence as General Staff Officer Grade-2. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College (DSCSC), Mirpur. He is also an MBA of South East University, Dhaka. Presently he is serving as General Staff Officer Grade-1 in Overseas Operations Directorate, Army Headquarters.

MARITIME COOPERATION IN THE BAY OF BENGAL RIM COUNTRIES

Commander S M Maniruzzaman, (L), psc, BN

Introduction

Maritime cooperation is the action, mutual assistance, cooperation and coordination among the maritime nations to ensure security, foster trade and commerce, maintain law and order, and to promote all the maritime activities in the region. Maritime environment is always complex, diverse and subtle due to its vastness, related legal issues, and un-exploitable nature. It is pretty difficult for a single nation to control and regulate the maritime area. It entails the cooperation and support of the maritime littorals.

The Bay of Bengal (BOB) is a sub-region of the Indian Ocean to the east of South Asia. It is situated between the continental sub-regions of South Asia (SA) and South-East Asia (SEA). The area is strategically important for the SA and SEA counties. It is the gateway for the Malacca strait and the transportation of energy for the China, Europe and the Pacific Rim countries. This bay is rich in minerals, fishes and huge untapped resources. Besides, the area is also possesses the unconventional threats such as piracy, gun running, drug trafficking, robbery etc. Two important gateways of golden crescent and golden triangle are also present in the area. Therefore, the area is required to be safeguarded for the safe and smooth commerce and for maintaining safe sea lanes for the world trade.

Maritime cooperation can ensure safe sea lanes of communication and provide safe trade and commerce. It will also ensure the legal exploitation of energy and resources by the littoral states. A comprehensive maritime cooperation needs the participation and assistance from all the littorals. The participation of the sub-regional, regional and global arena can enhance and promote the maritime cooperation in the region. To promote maritime cooperation in the region, joint patrolling, surveillance, sharing of information, funds and resources are essential. A joint surveillance, coordination and information centre between the participating states would obviously enhance the cooperation. The integration of the other regional cooperation and association in the region would also improve the cooperation in the BOB.

Hence, the paper will focus firstly, on necessity of regional maritime cooperation to enhance regional security. Secondly, it will highlight the requirement of joint activities in the regions and also would focus on the integration of sub-regional and regional power to enhance the maritime cooperation, which will finally improve the regional security, promote trade and commerce and maintain law and order in the region.

Aim

The aim of this paper is to determine feasible maritime cooperation in the BOB rim countries to enhance maritime security.

Objective of Maritime Cooperation

The main requirement and objectives of Maritime Cooperation are as follows:

- To foster maritime cooperation and dialogue among the littoral states of BOB and to promote maritime confidence and security building measures.
- To promote adherence to the principles of the 1982 UNCLOS, to commence dialogue on the areas of UNCLOS.
- To safeguard the peaceful merchant-shipping of the region and to examine the means for developing procedures to assist in the protection of shipping.
- To create a secure atmosphere for the sustained exploitation of the resources of the sea and conduct joint surveys in those waters with greatest priority.
- To contribute to the preservation of the marine environment.
- To undertake policy-oriented studies on specific regional maritime security problems and to provide training in relevant aspects of maritime operations.

Geo-Strategic Importance of Bay of Bengal

The BOB is centrally located between the Middle East and the Philippines Sea. It lies at the centre of SA and SEA's huge economic blocks. It provides access to the China's southern landlocked region, major sea ports of India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Thailand, Strait of Malacca littorals in Malaysia and Indonesia to the Indian Ocean. Most of these countries are rising economically where India and China play the most dominant and crucial role. The BOB is strategically crucial for India since it naturally extends its sphere of influence to include potential sources of natural resources. The major concern is the outlying islands, namely Andaman and Nicobar and, most importantly, several major ports like Kolkata, Chennai and Vizag in the BOB.

The BOB is one of the world's sixty-three large marine ecosystems. The littoral countries' population represent 25% of the world's total population and the most populous coastal region of the world where the super power US involve directly to have its traditional dominance here. On the other

Figure 1: BOB Area.

hand, China is increasing influence in the region and physical presence to ensure its trade and commerce. Meanwhile, India considers BOB as its own lake and never likes to allow any other stakeholder to dominate the region.

Smaller littorals of BOB offer tremendous economic potential due to untapped natural resources. It is a compact water body enclosed from three sides. Major sea lanes traverse through it either via Malacca Strait to SEA and the Far East or to Australia. The Singapore, Malacca, Thailand and Indonesia are geostrategically linked to the BOB. The BOB washes the shores of Indonesia, Myanmar, Bangladesh, India and Sri Lanka.

Figure 2: Sea Line of Communication

Strategic Choke Point

The Strait of Malacca is a narrow waterway between Malaysia and Sumatra islands of Indonesia. Indeed the entire commercial sea traffic between Europe and the Middle East passes through the strait. More than 50000 vessels per year transit through the Strait of Malacca. The one-third of the world's trade and almost East Asia's entire oil pass through this strait. The Strait of Malacca is one of the world's hottest and most crucial strategic choke points. It is considered one of the most vulnerable objectives whose neutralisation will cause tremendous damage to the very existence of the economy of the west, SEA, China etc. Controlling of the straits of Malacca is presently a key strategic objective of China. Moreover, China considers its surge into the region as part of a strategic surge of global proportions. Due to the presence of Malacca strait, the possibility of a major military clash with other powers in the foreseeable future can not be ignored. The Strait of Malacca dominates more than the commercial and economic lifelines into and out of the rapidly expanding economies of the East Asia. The global strategic growth and expansion of aspiring powers can be contained and regulated through the mere control over the movements of their naval forces through the Strait of Malacca. London based International Institute for Strategic Studies said that if International terrorist are poised to strike ship at the narrowest point of the straits (1.5kms) 'would cripple World Trade'.

Chinese Factors in the BOB Calculus

With the emergence of China as a global power, the BOB is slowly gaining a different momentum. If China meets its military potential, the Indian Ocean will feel its presence, as will the BOB. The maritime security of the narrow Malacca Strait canalizes China's maneuver towards the Indian Ocean. The BOB provides the bridgehead between middle east and china. China strives to avoid contention in the Strait of Malacca by directly entering into the Myanmar and Bangladesh by land from the Yunnan province. Access to the energy resources of the BOB also a keen interests of Chinese. During the recent standoff between Bangladesh and Myanmar, China played a significant role in defusing tension between the countries. Notably, both countries depend heavily on China for security and economic development. The safety of shipping and the smooth flow of traffic through international sea lanes is important to China. Again both China and India are importing increasing amounts of energy along sea lanes of BOB.

Maritime Cooperation to Support Maritime Security

Maritime security is a multi-disciplinary concept that involves military science, police science, domestic and international laws and geopolitics of the area concerned. The maritime security affects territorial integrity, human security and economic prosperity. It is a vital aspect of a nation's comprehensive national security, presupposed security of terrestrial area of an ocean. Broadly, it entails security from crimes at sea, resource security, environmental security, and security of seafarers and fishers. These threats broadly termed as low-intensity conflicts related to the sea are shown here:

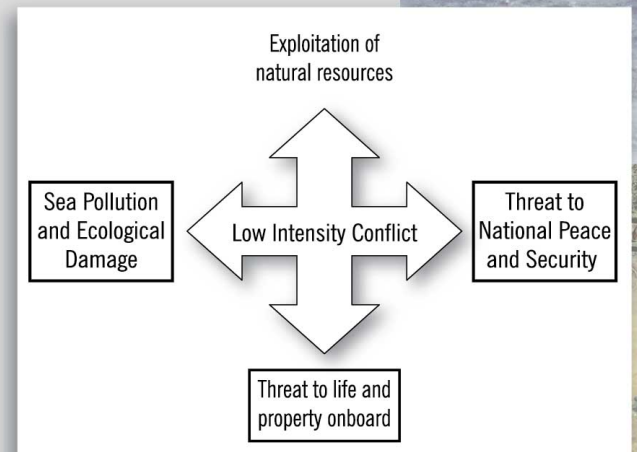

Figure 4: Maritime Crime

Bangladesh, which confronts both conventional and nonconventional maritime security threats, needs bilateral, national, regional, and global approaches to address these threats. As most non-conventional maritime security threats are trans-boundary in nature and as all littoral members face these trans-boundary maritime security threats, an individual approach cannot solely address these threats. Ocean good governance, maritime security, human security, state security — all is interconnected. Therefore, these cannot be dealt with in segregation. Regional approach toward ocean management sensible as it brings the key actors — national, regional, and global in a single continuum. In a globalised world, regional connectivity vis-à-vis ocean management, to promote regional maritime cooperation,

thereby enhancing ocean management needs firm implementation. Non-conventional issues require a regional joint cooperation and global efforts as well. The littoral states of the BOB need exploring all opportunities for negotiations so that all can play an active regional role to establish a democratic ocean management order,

By the turn of the century new types of threats, posed mostly by non-state actors. Many of them are specific to the sea. These wide spectrum maritime crimes of international nature range maritime territorial disputes, inter-state conflicts, piracy, maritime terrorism, illegal weapons trade, human smuggling, maritime pollution, protection of sea lines of communication, sea borne trade, drug trafficking, gun-running, accidents, mining by non-state actors, illegal exploitation of living and non-living resources, natural disasters, climate change etc.

Golden Triangle and Golden Crescent. Arms smuggling is very profitable business in the region. The narcotic drug trafficking passes through the Golden Crescent involving Pakistan, Iran and Afghanistan and the Golden Triangle including Myanmar, Thailand and Laos. A number of extremist groups have become active in drug trafficking, gun-running here. As a result, north of Andaman Islands, BOB littoral areas have become a nest of terrorists involved in the shipment of drugs and arms. Arms are brought from Laos, Cambodia and Thailand and transported to Northwest of india and Bhutan. The route from Bhutan passes through the northern Bengal, Assam and Meghalaya. The BOB and its contiguous waters have always had a major share of global pirate's attacks and armed robbery in territorial waters due to dense shipping trail, maritime policing and favourable hide to vanish environs.

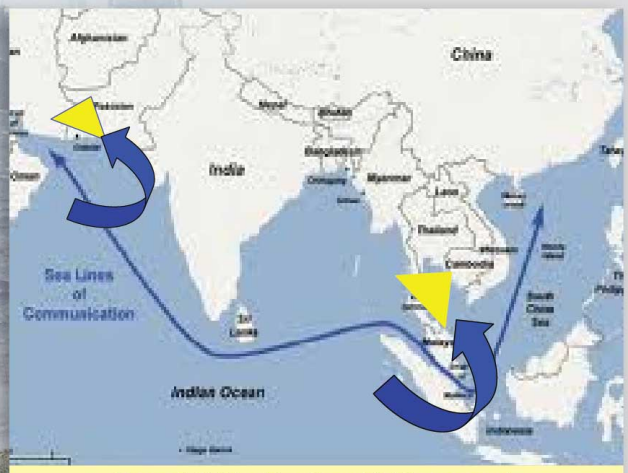

Figure 5: Golden triangle and Golden crescent.

The responsibility for the security of the BOB including Andaman and Nicobar Islands and also the waters extending to the six littoral states in the region namely Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia and Sri Lanka needs combined coordinated actions. Since the law of the sea is still inadequate to deal with them, regional cooperation is the obvious answer to this new challenge. The BOB and its adjacent waters form an ideal maritime zone to evolve such cooperative mechanisms.

Present Maritime Cooperation

India, Thailand, Indonesia. New Delhi has been coordinating the joint patrols with Indonesia in the Andaman Sea since 2002, occasional joint naval exercises with Thailand since 2003 by creating common stakes in the

maintenance of peace and stability in the region.

India, Sri Lanka and Pakistan. In South Asia, there has been a fair amount of effort directed at maritime cooperation between India and Pakistan, as well as between India and Sri Lanka.

China, CSCAF, RMSI and ARF. Chinese participation in the ASEAN Regional Forum (ARF) and the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) for combating piracy and the Regional Maritime Security Initiative (RMSI) of the United States is an example of multilateral maritime cooperation.

Indonesia, Philippine, Australia. Tri-nation coastal watch service (CWS) monitors and interdict in the region. There are around 20 ships participated in the CWS.

Mechanism for Maritime Cooperation

Maritime security in the BOB entails a concerted effort among littoral coastal states, landlocked states, flag states and maritime industry partners. Maritime space belonging to BOB littorals has to be secured from military and non-military threats. The mechanisms often employed include physical security measures, naval operations, crisis management, intelligence gathering, surveillance, patrolling, and risk management. Preventive and protective measures against infringement of maritime boundaries and security incidents affecting ships, offshore resources, crews, cargoes, port facilities and the people who work in sea areas surely demands concerted efforts by many maritime authorities besides the navy. The task of monitoring vast maritime zones of each state is too big for individual states to perform effectively. Their individual resources, which at the moment are spread too thin, can be better utilised if the neighbouring states initiate a framework of regional or sub-regional cooperation.

Regional Cooperation

Maritime cooperation is always complex, diverse and responsive in essence. It engulfs many organisations and states for a coordinated approach. A comprehensive approach to maritime security certainly demands a central national organisation to deal with the matters. A new organisation Association of Bay of Bengal Rim Countries (ABBRC) may be formed. Under the rubric of ABBRC, a Regional Maritime Cooperation Center (RMCC) is to be formed. An ocean-based traffic system under RMCC that goes beyond the capability of a nation's Coast Guards needs exploring to enhance regional maritime cooperation. There will be also an Information Sharing Centre (ISC/MIC) in the RMCC. RMCC will organise capacity building, joint exercises, facilitation of extradition, mutual legal assistance and encouragement of ships to take protective measures. Therefore, joint surveillance and patrolling

by regional states ensures pervasive coverage of the vast ocean.

Moreover, sharing of funds, tasks and information between the regional countries is necessary. Regionally, Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation stands as one of the outstanding examples of regional maritime cooperation among its 44 member states.

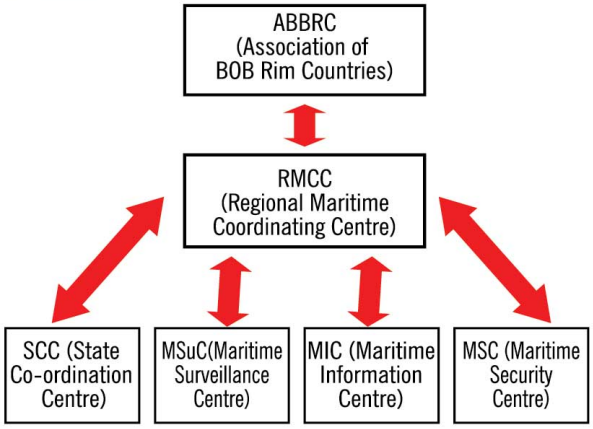

Figure 6: Regional Maritime Cooperation and Coordinated Action.

RMCC would coordinate all activities related to detection and prevention of security threats emanating from the sea, movements of vessels and all sort of maritime activities in the area. The purpose of RMCC would be to promote cooperation amongst various maritime enforcement agencies so that they can act together to fight threats to the maritime community and act as liaison between law enforcement agencies, maritime community and government. The associate members would include representatives from concerned ministries, enforcement agencies, public sector maritime agencies and private sector maritime communities.

Smooth functioning of the maritime activities needs effective regional cooperation that demands the following steps:

- **SCC.** Establishing a state coordination centre (SCC) that will collect individual state maritime information through SCC and will share the information to the respective security forces and to the RMCC.
- **MSuC.** Establishing a regional maritime surveillance centre (MSuC) under RMCC for common access to monitoring, surveillance and joint patrolling systems in the region. Joint patrolling by the littorals on mutual agreement.
- **MIC.** Establishing a regional maritime information centre (MIC) under RMCC for common access to all types of information systems in the region. Common training programme etc.
- **MSC.** Establishing a regional maritime security centre (MSC) under RMCC for common access to maritime security and all types of threats in the region. There will be also mutually agreed maritime border management mechanisms which would include commonly accepted measures for curbing criminal activities across the border.
- Reciprocal enforcement of each others' laws. It is facilitated if there is a commonly agreed view on the subject.
- Joint enforcement and sharing of or delegating responsibilities, for example, in the context of hot pursuit, through the creation of joint institutions specified for the purpose.

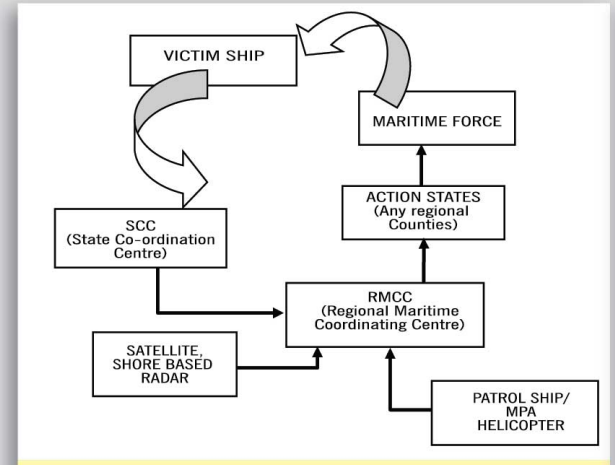

Figure 7: Regional Maritime Cooperation and Coordinated Action.

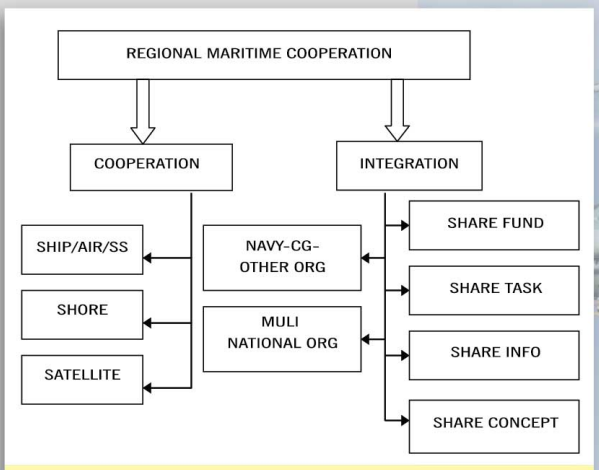

Figure 8: Integration of Regional Resources.

Regional Integration

Besides national efforts, regional or global cooperation is also necessary to ensure maritime security, in particular against transnational non-military threats. A regional maritime cooperation in the SA and interoperability with SEA are to be maintained for effective maritime cooperation in the BOB. Maritime arena is always vast, diverse and adventurous in nature; thereby it always demands joint activities of various nations, forums and organisations. In the Bay of Bengal context, a close cooperation and integration in the regional forums and associations are to be developed. In this region, an overlapping areas and responsibilities between SA, SEA, ASEAN, IORRC and other organisations exist. This integration may share and divide the tasks and responsibilities and exchanges of information and interoperability among these forums. A Joint patrolling off the Malacca Strait by Malaysia, Singapore and Indonesia is instances of multinational cooperation.

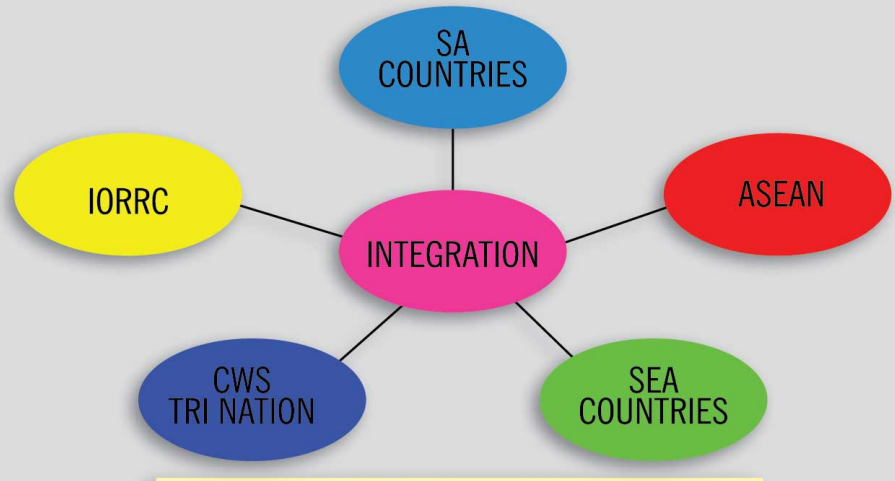

Figure 9: Maritime Integration

The holistic regional maritime cooperation would function as follows:

- RMCC will promote regional cooperation through functioning its functional organs like MSC, MIC, SCC and MSuC. The functional organs will share its information to the RMCC and thus RMCC will take necessary actions through the respective state forces.
- RMCC will operate and integrate regional maritime resources. It will also implement the ABRCC rule of law through MSC.
- Establishing and operationalising a BOB rim network of surveillance, to vigil at trans-boundary crimes through MSuC.
- Formation, under the BOB rim umbrella, an ocean-based traffic system, manned by BOB rim, which will go beyond the capability of a nation's Coast Guards. This may help to evolve an effective regional joint management of maritime resources and governance, enhancing maritime security in the region.
- Establishing and implementing of a BOB rim MSC. Appropriate joint training on maritime security is to be arranged. These will give rise to increasing awareness about maritime security and ocean management.
- RMCC must maintain coordination with the International Chamber of Commerce (ICC) website which gives details of location, nature of attacks,information and possible warning etc. An anti-piracy centre is proposed to be established in Batam Island (Indonesia) opposite Singapore. It will track all shipping in the Malacca Strait and adjacent waters. This will be based upon the reporting by merchant vessels only. It is also envisaged to have a computerized monitoring system and a reaction fleet of fast patrol vessels or aircraft for taking effective counter-measures.

Challenges

Maritime states are unable to take adequate steps against various types of maritime crimes due to the limitations of international law (UNCLOS-III) dealing with such crimes. Regional action is hampered because of an outmoded frame of international law, especially relating to hot pursuit. Pirates move swiftly with exceptional nautical skill and avoid sticking to a single nation's territorial waters in order to avoid hot pursuit. This prevents the Navy and coastguards from approaching them as it would involve transgressing into another state's waters, thereby creating a jurisdictional problem. The problem is most states lack bilateral or multilateral arrangements to permit other navies/coastguards to indulge in hot pursuit of pirates into each others waters.

The financial and technological constraint in trying to manage huge maritime zones that several of these states have inherited under the

provisions of UNCLOS-III. Obviously, cooperation at bi-lateral, sub-regional, regional and global level would provide the way out.

Conclusion

Maritime arena is always complex, diverse and vast in essence. Therefore, it generates enormous maritime security threats. To counter these threats a well coordinated regional maritime cooperation is essential. The BBOR is a vast area and is strategically very important in the world affairs. The area contains the strategic choke point of Malacca straight. The area is very close to the Middle East energy rich area. The entire energy is channeled from Middle East to ASEAN, East Pacific region as well as China.

The BOB is centrally located between the Middle East and the Philippine Sea. It lies at the center of two huge economic blocks, the SA and SEA. China's southern landlocked region, major sea ports of India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Thailand, and Strait of Malacca littorals in Malaysia and Indonesia provide access to the Indian Ocean through BOB. Most of these countries of the BBOR are rising economically. Within these areas, India and China play the most dominant and crucial role. The BOB is strategically crucial for India as well as China due to the military and economic reasons. 80 per cent of the Chinese fuel passes through BOB and two major islands namely Andaman and Nicobar lie along the coast of BOB.

For smooth functioning of maritime cooperation of the BBOR countries, it needs to ensure the maritime security. Maritime security challenges of the 21st century include maritime territorial disputes, inter-state conflicts, piracy, maritime terrorism, illegal weapons trade, human smuggling, maritime pollution, protection of SLOC, drug trafficking, gun-running, accidents, mining by non-state actors, natural disasters, climate change etc. To address all these, an effective maritime cooperation in the regional arena needs to be set up.

Maritime cooperation engulfs many organisations and states for a coordinated approach. Maritime cooperation in the BOB entails a concerted effort among littoral coastal states, landlocked states, flag states and maritime industry partners. A comprehensive approach to maritime cooperation certainly demands a central national organisation to deal with the matters such as ABBRC may be formed. Under the rubric of ABBRC, a RMCC is to be formed. Under RMCC ISC/MIC, SCC, MSuC, MIC, MSC may be set up for the smooth functioning of the maritime cooperation.

In addition to all above, regional integration of the maritime organisations and forums are also necessary to work united and synergetically. This comprehensive set up of maritime cooperation obviously would ensure maritime security.

BIBLIOGRAPHY

1. Berlin, D., 'Indian Ocean Redux: Arms, Bases and Re-emergence of Strategic Rivalry', Indian Ocean Studies, Vol. 10, no 1, 2002, p. 27.
2. Dr M Rahmatullah, Co-operation between Bangladesh and the Indian bordering states, Bangladesh Institutes of International and Strategic Studies (BIISS), Volume 22, Number 4 October 2001.
3. Alam, M.K., 'Regional Maritime Co-operation under the Auspices of the South Asian Association for Co-operation (SAARC)', BIISS Journal, Vol. 18, No 1, 1997, pp. 19-41.
4. Ambatkar, Sanjay., Indian and ASEAN in the 21st century, Anmol publications, New Delhi, 2002.
5. ASEAN Secretariat, http://www.asean.
6. http://"http://www.greekshares.com/global_energy.asp"
7. Jalan, Bimal., India's Economic Policy-preparing for 21st century, Penguin Books, New Delhi,1997.
8. Krueger A.O. (Regionalism and Multilateralism in International Trade, NCAER, New Delhi, 1999.
9. Raman. B., The Bay of Bengal, Paper No. 215, 26th March2001. http://www.hvk.org
10. Roy, Mihir., The strategic importance of sea borne trade and shipping at http//i-dun.its.adfa.edu.au/ADSC/SlocRoy.htm, 2001.
11. Singh. Dr.Uday Bhanu, Dialogue, Jan-March 2004, vol.5 No.3. http://www.asthabharti.org

Commander S M Maniruzzaman, (L), psc, BN, was commissioned on 1 July 1996, in the Electrical Branch of Bangladesh Navy. He completed his graduation degree on Electrical and Electronics Engineering from CUET, Chittagong. He has attended number of courses at home and abroad. He was trained on Engine Control and Monitoring System from Germany and Canada. He has completed his staff course from Defense Services Command & Staff College, Mirpur. He has served in various ships and establishments of Bangladesh Navy. He has also participated in the United Nation Peace Keeping Operation as Military Observer in Congo. He is happily married and blessed with one daughter and one son. Traveling, reading books, internet browsing and watching movies are the authors favourite hobbies.

INSPIRING YOUNG GENERATION WITH TRUE SPIRIT OF GLORIOUS TRADITION, ETHOS AND VALUES OF OUR HEROIC LIBERATION WAR

Major Dilip Kumar Roy, AEC
Major Sinthia Sarmin, AEC

Introduction

Liberation war is the most treasured and epoch making episode of valour and courage for the people of Bangladesh. Independence is our heroic achievement, true love and profound passion. Freedom fighters are our real pride and icon of heroism because of their remarkable sacrifice. In the true sense of its term, they are the fountain source of our courage, devotion, dedication and patriotism. Responding to the clarion call of the father of the nation, the countrymen from all strata participated in the Liberation War and achieved ultimate victory on 16 December 1971. The people of this soil earned their beloved 'Red over Green' flag through an arduous struggle and unforgettable sacrifice. As such, Bangladesh came into being on the world map as an independent state through a lot of bloodshed after a nine-month long armed struggle.

At the historic clarion call of the father of the nation, the visionary leader and the greatest 'Bangalee' of all time Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the people of the then East Pakistan were involved into the War of independence after the horrific night of 25 March 1971. The whole country had been divided into eleven sectors and Bangladesh defence forces having General M A G Osmany as the Commander-in-chief (C in C) with wholehearted support of mass people snatched away the victory. Being blessed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabir General M A G Osmany played a pivotal role to form a formidable armed forces for the new nation. All the members of Bangladesh armed forces fought valiantly with limited resources against the giant Pakistan occupational military forces.

The present generation of Bangladeshis is very fortunate to have such a remarkable time and cooperation from the highest level of the country to nurture ethos, values and true spirit of our most important and eventful episode of the state. Their patriotism and patriotic attitude can be developed significantly by studying the contributions of mass people from all walks of life as well as the contributions of armed forces in the emergence of independent Bangladesh. It is our solemn responsibility to take all possible endeavours which will evoke the history of the Liberation War in the right perspective among all the people of the country. Therefore, the paramount

need for identifying ways to nurture the history of Liberation War by educational institutions and the organisations concerned are of great importance. Our new generation should be properly informed about the sacrifice of thirty million people of the country during the Liberation War. This paper takes a humble initiative to highlight the present state of nurturing true history of our great War of Independence and suggest a set of recommendations which will stimulate patriotism, ethos, values and overall spirit of Liberation War among new generations.

Reasons for Nurturing the History

History repeats itself. History is also supposed to be constant and static. But, it is sometimes distorted and fabricated to serve political interest. George Orwell has rightly said that the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. At the same time Confucius said, 'Study the past if you would define the future.' Due to some reasons and biasness of a few teachers, students do not get the real history of the Liberation War during student life. Besides, history of the Liberation War should not be treated only as a subject for classrooms. It is one of the most important sources of our identity and inspiration. But, this is undeniably the most essential part of national spirit.

There comes the basic necessity of nurturing the history of Liberation War in all levels of our society. To infuse patriotism in new generation, there is no alternative to teaching the real history which we earned through a nine-month-long armed struggle.

The nation should know its predecessors' contributions as freedomfighters to liberate the country. This is how they will feel proud and get inspired and dedicated. At the present context of the country, it has become a paramount need to impart patriotic inspiration in our young generation. The history of Liberation War is one of the main ingredients for inculcating patriotism in the school going boys and girls. It is needless to say that still there are some people who are active with radicalised agenda to damage our national progress and image. In doing so, their lucrative target is to destabilise the law and order situation. To prevent them from wrongly motivating the young generation of our country, they need to be imbued with true spirit of the Liberation War.

Existing Efforts to Nurture the History of Liberation War

At present nurturing the history of Liberation War in the country is done in various educational institutions through text books. A good number of lessons on our Liberation War have been incorporated into text books in the

last few years. These will undoubtedly help the students as well as our young generation imbue with patriotic zeal and solemn spirit of our independence. Freedom fighters are also invited in different occasions to share their experiences. Some efforts were made to accumulate the local Liberation War history from all over the country.

A few good movies have been made by some prominent media personalities in the past on the spirit of our great Liberation War. But more movies should be made by youngsters in the days to come. These will help to induce patriotism in our hearts and minds and thereby assist to build a spirited and patriotic new generation. Effort can be made to find out effective means of nurturing the history of Liberation War in all levels.

Ways to Nurture the History of Liberation War

We have to prepare more number of documentaries based on the struggles for our independence. There were lots of battles fought at various places in our country in 1971. Some of the legendary and courageous freedomfighters are still alive and bearing the memory of those battles. Some places are still bearing the proof of events in 1971. It can be explored and prominent film makers may make documentaries related to our heroic Liberation War. Adequate patronisation may be sought from the national level as it is very positive to adore our culture, heritage, ethos and values of the Liberation War.

Movies are one of the most effective means to nurture history. Its effect on people of all walks of life is remarkable. People become highly touched and immensely moved by the facts of our heroism displayed in 1971. Almost all countries including our neighbour India are very active in preparing war movies. Extra efforts may be taken to launch joint-venture objective movies on the Liberation War.

Story writing competition has created a new dimension to stimulate the patriotism and spirit of the Liberation War among the students. Literary works such as poems, stories, arts, paintings etc. may be taken from students with a view to inspiring them with the spirit of the independence. This event may be included in government-run talent hunt programmes. The ministry concerned may encourage write-ups on Liberation War with the inclusion of due incentives. Steps may be taken to publish those in different electronic and print media, so that people come across them in no time.

We may attach enhanced importance to the history of the Liberation War in various relevant training curricula with proportionate weightage distribution. Courses attended by officers and others may be given due importance on the said topic and can be included in the syllabi. It will create an extra momentum in the minds of officers to have a thorough research on the particular topic.

Generating research works on the Liberation War, especially during the courses designed for high ranking officers. Thesis paper and research works may be introduced in the courses with the inclusion of offering relevant post graduate degrees/diplomas. Besides, all universities and relevant research institutions may introduce degrees on Liberation War.

'Liberation War History Club' should be opened in every organisations, so that users may enrich their tender mind with the spirit of the Liberation War.

Different quiz competition may be arranged on our Liberation War. This will make the participants go through the books on the Liberation War and equip themselves with enhanced knowledge on the said subject.

Expert team may go far. Students at all schools and colleges should be given proper grooming and due emphasis on Liberation War. If they are properly groomed up and instilled with Liberation War spirit, our future generation will be more patriotic, more spirited, and more sacrificing for the nation. This initiative will also inspire the young generation with the same deep sense of patriotism possessed by the freedomfighters.

All military units and formations organise cultural programmes with the very essence of blending war spirit with ongoing military culture and scenario. Special fare may be organised by different organisations displaying the rare pictures of our Liberation War.

Electronic and printing media may play the pivotal role in cultivating and nurturing the historical theme of the Liberation War. It is the most effective means of inculcating and imparting the values of liberation war among the new generation.

War museums are to be enriched in the most befitting manner so that youths are attracted toward these museums. Even in the Army, almost all divisions possess war museums, which need our keen attention. War museums may be enriched with the appropriate focus and historical settings.

More number of monuments and sculptures based on Liberation War themes may be constructed to inspire the young generation about the war. It may be established in an increased scale in the military premises also.

The teachers should play vital role in flourishing Liberation War spirit among students for establishing the universal nonsectarian conscience of Bangladeshis to establish a secular Bangladesh as dreamt by our father of the nation. We may urge teachers for inspiring young generations with spirit of the War of Liberation to strengthen their patriotism and democratic ideals through educating them on our great war. We may also urge teachers for inspiring students in writing more letters on War of Liberation for sending those to the Liberation War Museum (LWM), so that students feel proud of their motherland and get imbued with the spirit of patriotism.

Resource personnel may be invited in talk show arranged by the TV channels every now and then. Even on the national days, tug of war may be arranged and telecast on all TV channels to motivate our young generation.

Observing the national days with due honour and dignity so that the young generations from their childhood learn to love their country and her people.

Conclusion

Four decades have already passed since we won the victory through our Liberation War. But still we could not have the sweet smell of its success to the fullest. What we were supposed to gain from this victory has not yet rightly come down to us. This is precisely because of the lack of careful nurturing of our Liberation War ideals, which have once again proved that to earn independence is tough, but to defend it is tougher. The very essence and spirit which was instrumental in the creation of this 'Sonar Bangla' is equally and increasingly central to bind the population with phenomenal harmony in the present days. Now as the new generation, this is our responsibility to nurture the history of Liberation War which was the one and only active war our army faced so far. The spirit of a nation as well as its army is the precious power to uphold the image of the nation and to keep the sovereignty of it at any cost. To infuse patriotism in most of the people as well as the professionals, we should spare no pains to nurture the history of our glorious Liberation War. Let us put our best effort to inspire young generation with the true spirit of Liberation War. Finally, we want to establish Bangladesh as a developed, prosperous and dignified nation, a peaceful nation in South Asia so that we can move ahead in global arena keeping our head high and it is possible only through establishing the true spirit of Liberation War in the minds of the future generation of Bangladesh particularly the youth to materialise the dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

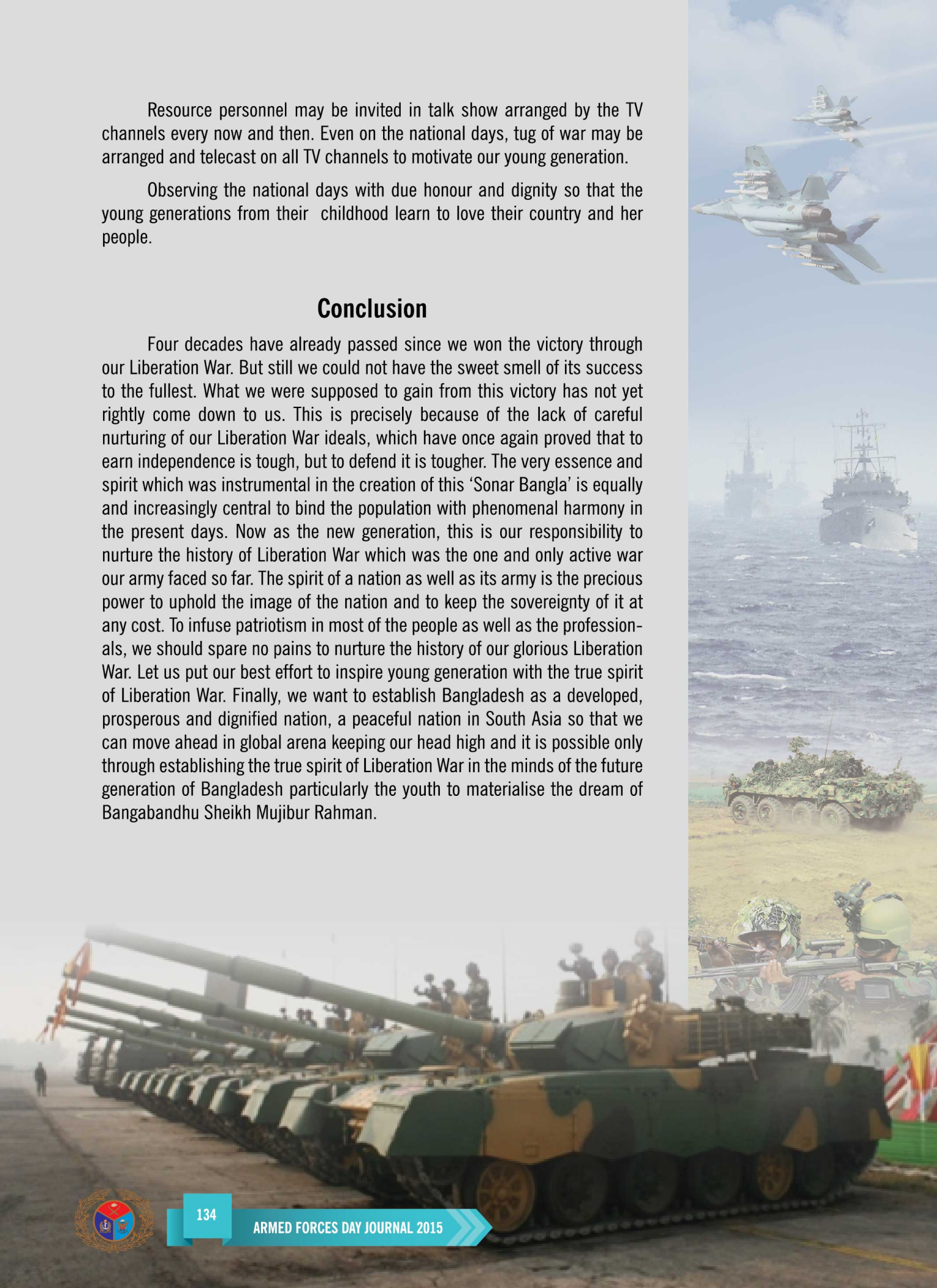

BIBLIOGRAPHY

1. Bangladesh at War, Major General Shafiqullah.
2. Historic Speech of 7th March delived by the father of the nation.
3. Emergence of Bangladesh, Abul Mal Abdul Muhit.

Major Dilip Kumar Roy was commissioned in the Army Education Corps in December 1998. He obtained his BA (Hons) and MA in English Literature from the University of Dhaka. He served as Instructor Class 'C' and 'B' in Bangladesh Military Academy (BMA), General Staff Officer-3 (Education) in an Infantry Brigade and Instructor Class 'B' in Military Institute of Science and Technology (MIST). He also served as General Staff Officer, Grade-2 in Education Directorate, Army Headquarters, Dhaka. He attended the UN Peacekeeping Mission in Sudan as a Protocol, Liaison and Civil Military Coordination (CIMIC) Officer. It is to mention that he has a good number of publications to his credit in different journals and newspapers. Presently, he is serving as the Principal of Bandarban Cantonment Public School and College, Bandarban.

Major Sinthia Sarmin was commissioned on 20 December 2005 with 24th BMA Special Course in Army Education Corps. Before joining Army she completed her Honours and Masters Degree in English from Bogra Azizul Haque University College under National University. Besides her mandatory courses she did Blended Communication Course in British Council and French Elementary and level-1 Language Course in BUP, Mirpur. She served in different instructional and staff appointments which include instructor class 'C' and 'B' in Bangladesh Military Academy and Military Institute of Science & Technology. She also served as General Staff Officer Grade-3 in HQ 86 Indep Sig Brigade and HQ 6 Indep ADA Brigade. She also worked in the capacity of Platoon Commander in BMA. The officer participated in United Nations Peace Keeping Mission as CIMIC officer in DR Congo. Presently she is serving as GSO-2 in Education Dte of Army Headquarters.

CHEMICAL WARFARE AND IMPLEMENTATION OF CHEMICAL WEAPONS CONVENTION IN BANGLADESH: CHALLENGES AND WAY FORWARD

Lieutenant Colonel Md Zakaria Hossain, psc, G

Chemical weapons are a kind of 'poor man's atomic bomb'. Iranian President Ali Akbar Hashemi, 1988, at the end of Iran's war with Iraq

Introduction

Any kind of warfare destines to death, injury, defeat or victory. Chemical warfare goes beyond that. Its effect may persist years after years, even decades. Bhopal's unending catastrophe is one of the burning examples in the history. Thirty years after the worst Chemical accident in history, the disaster is hitting a new generation. One of the famous writers wrote about it — 'The people can't see, smell or taste the poison, but it's there, it's in the water, in the flesh of fish and in the milk of water buffalo'. Iraq used chemical weapons in Iran during the war in the 1980s, and Iraq also used mustard gas and nerve agents against Kurdish residents of Halabja, in Northern Iraq, in 1988. The horrific pictures of Halabja victims shocked the world at the time of the negotiations in Geneva on the Chemical Weapons Convention (CWC).

The devastating impact of chemical weapons have had in the past, and the potential for the use of modern — even more deadly — chemical agents not only by States at war but in other violent conflicts and by non-State actors, provide the imperative for the international effort to uphold the ban on such weapons and to work towards the complete, global elimination of chemical weapons. Apparently, it seems that witnessing of Chemical warfare in the world is less likely but the possibility of happening can not be overruled. Bangladesh being positioned in a very strategical place in South Asia of the world, must have an all out preparedness not to be affected in any way by the effect of chemical weapons. To protect its 160 million people, Bangladesh needs to oblige all obligations of the convention of chemical weapons and as well as to have gradual preparedness to protect and assist the people in case of any chemical hazards.

Armed Forces Division is responsible to act as National Authority for the implementation of CWC in Bangladesh since 1997. National Authority is efficiently performing its sacred duties but still has some scope of utilising of its full potentials in the field of implementation of CWC in Bangladesh.

In this paper, a brief history of Chemical warfare is stated and then given an overview of CWC and Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Thereafter, the role of National Authority and Chemical

Environment in Bangladesh is discussed. Finally, a few suggestions have been made for the National Authority to move forward basing on the challenges and reality.

Brief History of Chemical Warfare

In 600 BC, Solon of Athens put hellebore roots in the river that served as drinking water for the city of kirrha. In 400 BC, Scythian archers used poisoned arrows and manure or decomposing bodies. Emperor Frederick Barbarossa used dead bodies to poison the enemy's water supply in the siege of Tortona in 1155. During the American civil war, John Daughty — a New York school teacher proposed the use of chlorine as a chemical warfare agent. He envisioned a 10-inch Artillery shell filled with liquid chlorine that, when released, would produce many cubic feet of chlorine gas. Chlorine first used as a Chemical Weapon in 1915 by Germany at Ypres, Belgium. 160 tons of Chlorine was released when wind was favourable, resulting in 5,000 dead and 10,000 wounded. Phosgene and Mustard gases were used by Germany at Ypres, Belgium in 1915 and 1917 respectively. Egypt used Chemical Weapons against North in 1966-1967. Iraq used Chemical Warfare Agents against its own Kurdish citizens in the town of Halabja, killing about 5,000 of the town's 50,000 residents. Nerve agent Sarin was released in the Tokyo Subway. In this attack 12 people got killed and 5,500 sought medical treatment.

Overview

Chemical Weapons Conventions (CWC). The CWC is an international non-proliferation treaty that bans the development production, possession or use of chemical weapons and requires the destruction of existing weapons. The treaty puts all the states parties on an equal footing. Countries having stockpiles of chemical weapons are required to declare and destroy them in a specified time frame and those who produce and use chemical that can be conveniently converted into chemical weapons have to be open and transparent about the use of these chemicals too. The convention was set by OPCW and opened for signature on 13 January 1993 in Paris. Under the convention, chemicals that are toxic enough to be used as chemical weapons, or that may be used to manufacture such chemicals, are divided into three groups according to their purpose and treatment:

Schedule 1. It has very small scale legitimate uses. These may only be produced or used for research, medical, pharmaceutical or protective purposes (i.e. testing of chemical weapons sensors and protective clothing). Examples include nerve agents, ricin, lewisite and mustard gas. Any production over 100 gm must be reported to the OPCW and a country can have a stockpile of no more than one tonne of these chemicals.

Schedule 2. It has no large-scale industrial uses, but may have legitimate small-scale uses. Examples include dimethyl, methylphosphonate, a precursor to sarin also used as a flame retardant, and thiodiglycol, a precursor chemical used in the manufacture of mustard gas but also widely used as a solvent in inks.

Schedule 3. It has legitimate large-scale industrial uses. Examples include phosgene and chloropicrin. Both have been used as chemical weapons but phosgene is an important precursor in the manufacture of plastics and chloropicrin is used as a fumigant. The OPCW must be notified of, and may inspect, any plant producing more than 30 tons per year.

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons(OPCW). The OPCW is the implementing body of the CWC, which entered into force in 1997. As of today OPCW has 192 member states, who are working together to achieve reduction of chemical weapons. The OPCW member states share the collective goal of preventing chemistry from ever again being used for warfare, thereby strengthening international security. The convention contains four key provisions:

- Destroying all existing chemical weapons under international verifications by the OPCW.
- Monitoring Chemical Industry to prevent new weapons from re-engine.
- Providing assistance and protection to state parties against chemical threats.
- Fostering international cooperation to strengthen implementation of the convention and promote the peaceful use of chemistry.

Implementation of CWC in Bangladesh

Position of Bangladesh on CWC. Bangladesh signed the treaty on 13 January 1993 and ratified it on 25 April 1997. Initial declaration of the Chemical Factories was made by Ministry of Foreign Affairs to OPCW on 1 September 1997. On 29 December 1997, Armed Forces Division is designated as National Authority and focal point to OPCW as regards to CWC.

National Gazette on CWC. The Chemical Warfare (Prohibition) Act, 2006 was approved by the Parliament of Bangladesh and was published on 24 September 2006. The salient aspects of the Gazette are as follows:

- Prohibits the development, production, acquisition, stockpiling, retention, use, or transfer to the CWs.
- Prohibits use of Riot Control Agents as a method of warfare.
- Prohibits construction of any premises or equipment intended to be used for production of the CWs.
- Prohibits from producing, using, acquiring, possessing, transferring,

importing or exporting any scheduled chemical, DOC except for permitted purposes under the CWC.

- Establishment of National Authority on the CWC in the Armed Forces Division.
- Allows verification activities as stipulated in the convention.
- Determines punishments/fines for violation of the provisions of the ordinance.
- Empowers the national authority on the CWC to make rules for implementation of the Act.

Organisation of National Authority on CWC. The Principal Staff Officer of the Armed Forces Division is made the Chairman of BNACWC through the National Gazette on CW (Prohibition) act 2006. Director General of Ops and Plan, Armed Forces Division is made the Secretary of the National Committee. Joint Secretary of Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law, Justice and parliamentary affairs, Joint Secretary, Ministry of Home affairs, Joint Secretary Ministry of Defence, Joint Secretary, Ministry of Industries, Joint Secretary Ministry of Communication, Joint Secretary, Ministry of Science and Information and Communication Technology, Joint Secretary, Ministry of Agriculture, one representative from National Board of Revenue, Chairman, Bangladesh Atomic Energy Commission, Chairman, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research, Chairman, Bangladesh Chemical Industry Corporation and one representative each (in the rank of BG) from Army, Navy and Air Forces are the member of the National Authority. National Authority sits once in six months and twice in a year to formulate policy for the implementation of CWC. National authority has an Executive Cell composed of one Lieutenant Colonel and two Major/equivalent officers to carry out the function of National Authority.

Activities of National Authority on CWC. National Authorities do some specific activities throughout the year which are mentioned below:

Enrolment of Chemical Facilities. Any person or organisation engaged in production, processing, acquisition, use, transfer, import or export of schedule or DOC is to be enrolled with BNACWC. BNACWC notifies this enrolment advertisement through National Dailies and welcome applicants from factories/importer of chemicals at regular interval. Applications are scrutinized by evaluation sub-committee and then enrolment certificate has been issued for five years to the eligible companies. Turn out of the issue is very discouraging. In 2011, total 25 factories applied for certificate. In 2015, when applications were asked from the factories, only one application from a factory is received by BNACWC. It implies that people are not serious about the matter. From a report furnished from Drug Administration found that many factories in Bangladesh use DOC without the certificate of BNACWC which is clearly violation of National Gazette.

Control and Monitoring by Port Authority. If any person or

organisation intends to import schedule or organic chemicals, needs to show certificate of BNACWC to the Port Authority. The message is given to all land, sea and air ports. The respective Port Authority checks the chemicals as per the import policy. They also scrutinize the list submitted by the importer. But unfortunately, it is never happened that the Port Authority has refused the release of chemical imported without the certificate of BNACWC.

Declaration to OPCW. Any factory producing schedule or DOC more than 200 tons per year is declarable to OPCW. BNACWC submits the declaration of the facilities to OPCW annually in a prescribed and a consolidated form. So far, 10 facilities were declared to OPCW. These declared factories are mainly urea production-based factory and there are two painting factories among them.

OPCW Inspections. Every year, an inspection team from CPCW carries out inspection at one or two specific facilities. This inspection team is escorted by the national authority comprising representative from various ministries and organizations. From 2008 to 2015, total seven inspections were conducted by OPCW in 10 facilities.

General Meeting of BNACWC. BNACWC conducts General Meeting at a regular interval. All 18 members and stakeholders participate in the meeting. In the meeting, the chairman of BNACWC gives guidelines for the implementation of CWC.

Training and Workshop. Every year OPCW offers many courses, which are held in different parts of the world. The courses are — procedure involve in deceleration, inspection, assistance and protection against Chemical Warfare Agents, checking system of customs authority, analytical analysis of chemicals etc. Form 1997 to 2015, 149 military staffs and civilians participated in different training courses offered by OPCW. BNACWC conducts various training sessions and workshops to increase awareness and capacity building in case of implementation of chemical convention. So far, total 228 people are trained by BNACWC.

Chemical Environment in Bangladesh

Generally, all the chemicals produced in Bangladesh are mainly used for peaceful purposes. Only some of the basic chemicals such as acid, alkali, oxidizing agent, organic compounds, etc are produced locally by different industries. Most of the other chemicals used in different chemical and Pharmaceutical industries, research institute, educational institute, etc are imported. It may also be mentioned that most of the chemical industries such as pharmaceutical industries, basic chemical industries, insecticide/ pesticide industries etc in Bangladesh are in private sector.

Bangladesh being a developing country, its industrialisation is growing

rapidly by setting different process/chemical industries by local and foreign investors. Pharmaceutical and allied chemical products have come-up and rising up to the level of attention. Next, pharmaceuticals, textiles, tanneries, pesticides and insecticides production are rapidly spreading sectors in the country. The production or use of chemicals in above sectors is increasing. On the other hand, the chemicals and dyes used in textiles, tanneries, pesticides, and insecticide industries are highly toxic and hazardous to nature. Presently, more than two hundred small and medium sized pharmaceutical factories are in operation in Bangladesh.

Challenges in Implementation of CWC

Easy to Make Chemical Weapons. The level of knowledge required to manufacture chemical weapons is on the order of a competent organic chemistry graduate student-having much less knowledge than required for making biological weapons. Most of the starting materials and equipment can be commercially purchased without being getting noticed or warning. The large amounts of industrial chemicals manufactured and shipped (e.g., chlorine) offer themselves as low-tech weapons of opportunity and terror.

Under Utilisation of Trained Personnel. The personnel are trained from OPCW remain scattered to their respective field of work. In absence of an organisational outfit, all these personnel cannot contribute as expected. BNACWC conducts some training which is mostly based on creating awareness to the people on CWC where some of them are being utilised as instructors while large number of trained personnel remain at far.

Lack of Knowledge and Non-compliance Attitude. Most of the owners of chemical factories who import chemicals for peaceful purposes have less-knowledge about the effects and consequences of chemical weapons, which may be formed in reaction through a chemical process by an unwanted man or a group. They have serious lack of knowledge on and complying issue with CWC which is clearly proved due to poor response on enrolment issue despite a good number of pharmaceuticals, textiles, tanneries, pesticide and insecticide factories are using highly toxic chemicals.

Online Reports and Returns. The factories or industries using scheduled or discrete organic chemicals, do not have an online link with BNACWC and Customs Authority for submission of proposal for importing chemicals. In absence of online network link, there are chances to have error in checking and monitoring system at every level.

Organogram of National Authority. In present organogram, the National Authorities do not have the expertise in getting expert opinion related to the chemical environment in Bangladesh. Members of National Authorities come from different ministries and organisation who have their own dedicated job and responsibilities other than spending times on chemical and chemistry issues. Despite having strong desires to contribute more in monitoring and controlling of the usage of chemicals in Bangladesh but due to

lack of time and expertise the end state is not as expected as it would be.

Checking and Monitoring System at Port. The port authority gives more emphasis to collect revenue. The rules and policy set by CW (Prohibition) Act, 2006 is not adhered strictly at port. If found importing DOC without the certificate of BNACWC, the person or the factory is not allowed to get release order from the port. But it did not happen in any of the ports that reveals the ignorance of the port officials.

Dedicated Force Against Chemical Attack/Incident. There is no dedicated force available in our country who can handle and protect the people during any chemical accident or incident. Chemical accident is totally different from any other disaster. People can go to rescue victims from any type of accident even without any equipment or gears. But in case of chemical disaster, people cannot go nearer to that place without proper gears and equipment. Specialised training and specialised equipment is always a must to fight against chemical disaster. A small scale dedicated force is required to remain prepared to tackle any chemical accident.

Transportation from Neighbouring Country. Bangladesh is blocked from three sides by India having land boundary of 4096 km and it has 270 km land boundary with Myanmar. India produces various types of chemicals. There is always a chance of transportation of chemicals from neighbouring countries with bad intention by unwanted persons or group to Bangladesh to fulfill their evil interest.

Way Forward

Having discused about the challenges of implementation of CWC, now to overcame all the challenges a few suggestions are made below which will act as a guideline for the Staff Officer of BNACWC to move forward.

Creation of Awareness. As the chemical activities are taking place silently in the factories/industries, people are least bothered about it. To change the mindset of the people who deal with chemicals, BNACWC needs to arrange more seminars and workshops to let people know that chemical weapons are easy to make by a terrorist and he can play havoc if it is released in a public place. So, they need to follow a strict discipline about the uses of chemical starting from import, storage, and use of surplus chemicals so that it does not fall under the hand of an unwanted personnel.

Review of Organogram. Organogram of BNACWC should be reviewed where a few number of scientists of chemistry background to be included. The executive cell should be commanded by a dedicated Director General and under him there should be at least two Civil Staff officers having a post-graduation degree in chemistry with experience of serving at chemical laboratories apart from existing officers of Armed Forces Division.

Strengthening the Supervision at Port. Checking of chemical at port site should be strengthened. To do so, assistance from Armed Forces can be

arranged since all the port sites (land, air and sea) are well covered by Navy, Air Force and BGB. A small team can be formed from each organisation to monitor the imported chemical under the supervision of BNACWC. Navy can take care of imported chemical through all sea ports, BGB can take care of the land ports whereas Air Force can take care of the air ports. The team will act as an augmented force to custom officials. Personnel from custom and the monitoring cell will be sent to undergo training under OPCW and BNACWC to know the procedure involved in checking imported chemicals

Formation of Response Force. Fire Service and Civil Defence (FSCD) should be identified as dedicated force to fight against chemical disaster. A small sec/wing could be included in the existing Table of Organisation of FSCD. This sec/wing will have its secondary role to fight against chemical hazards apart from its classical primary role. This sec/wing will be equipped and trained so that they are always ready to fight against chemical hazards.

Online Reports and Return. All chemical factories and industries dealing with chemical should be integrated in a networking system with BNACWC and all ports. The proposal for importing chemical should be submitted online, to BNACWC as well as to the particular port from where chemicals to be imported. All records such as amount of chemical imported, used, and surplus should be submitted yearly to BNACWC online. This system will provide BNACWC with better monitoring capacity in the chemical arena.

Conclusion

The devastating impact that chemical weapons had in the past still shock the people of the world. Though the chances of chemical warfare are less likely but the possibility of happening cannot be overruled. To reduce the vulnerability of being affected by chemical weapons either by a terrorist attack or by industrial hazards, Bangladesh needs to oblige to all bindings of the chemical weapons convention.

Bangladesh being a developing country, is growing faster due to increasing local and foreign investments. The chemical that are used in pharmaceuticals, textiles, tanneries, pesticide and insecticide industries are highly toxic and hazardous in nature. BNACWC being an apex body for Controlling and Monitoring of schedule and DOC needs to play greater role to ensure the safe chemical environment in Bangladesh. More number of seminars, workshops on strengthening checking system at ports, online reports system by factories are needed to be conducted by BNACWC in accordance with the guidelines given by the international stakeholder and thereby increase the awareness among the people who deal with chemical. FSCD may be augmented with proper equipment and gear to keep them ready to fight against chemical hazards.

BIBLIOGRAPHY

1. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction. Published by OPCW.
2. A Handbook on Assistance and protection against chemical weapons by India on 25 August 2014.
3. A Handbook on Assistance and Protection against chemical warfare agents by Pakistan on 25 October 2014.
4. Bangladesh Gazette, The Chemical Weapons (Prohibition) Act, 2006.
5. Interaction with the members of Roxy Paints and Berger Paints during Local Inspection carried out on 15 October 2014 and 19 October 2014 respectively.
6. Interaction and Interview with the Chairman and Members of BCIC and BCSIR on 26 November 2014 and 02 December 2014 respectively.
7. Information obtained during inspection to Urea Fertilizer Factory Limited, at Palash, Narshingdi and Chittagong Urea Fertilizer Factory Limited by International Inspection Team on 15 to16 February 2015 and 18 to 19 February 2015 respectively.
8. Interactive Session held with the members of Pharmaceuticals and Members of Private sectors Chemical Factories on 04 March 2015 and 17 June 2015 respectively at AFD Conference Room.
9. Yearly Declaration Report Received from Drug Administration on 08 March 2015.
10. Interactive session with custom officers at Custom House, Dhaka on 12 August 2015.
11. http//www.wikipedia.org
12. http//www.thiweek.com

Lieutenant Colonel Md Zakaria Hossain, psc, G, was commissioned with 26th BMA long course in the Regiment of Artillery on 9 June 1992. He served in several artillery units at various command and staff appointments. He served as GSO-3 (Ops), GSO-2 (I&CB) and as a Brigade Major of Artillery Brigade Headquarters respectively. He served as Staff Officer Grade-1 at ARTDOC. He commanded 7 Field Regiment Artillery. He attended a number of courses at home and abroad. He is a graduate from DSCSC, Mirpur. He served in two UN Missions as contingent member and military adviser to Sector Commander of a Headquarters respectively. At present, he is serving in Armed Forces Division.

লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলার আয়োজক হিসেবে আমরা গর্বিত

২০১৪ সালের ২৬শে মার্চ লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা গাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ব রেকর্ড গড়ার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনের প্রেক্ষাপট ছিল ব্যাপক। তারই কতিপয় তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলায় চূড়ান্ত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা- ২,৫৪,৫৩৭ জন।

২। আগত অংশগ্রহণকারীদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য নিযুক্ত ব্লক ম্যানেজারের সংখ্যা- ৬৪০০ জন।

৩। নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যদের সংখ্যা- ৫৪১৭ জন।

৪। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যসংখ্যা- ১৫০০ জন।

৫। চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল সহায়ক- ২২১ জন।

৬। আগত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণকৃত খাবার প্যাকেট- ৩ লক্ষ ১০ হাজার টি।

৭। খাবার বিতরণ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যসংখ্যা- ৫২২ জন।

৮। অংশগ্রহণকারীদের ভেন্যুতে আগমনের জন্য নিযুক্ত যানবাহন সংখ্যা- ৩০৬৪টি।

৯। ভেন্যুতে প্রবেশকারীদের সঠিক গণনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত টার্নস্টাইল সংখ্যা- ২০০টি।

আলোকচিত্রে সশস্ত্র বাহিনী

যে অতীত আমাদের প্রেরণার উৎস

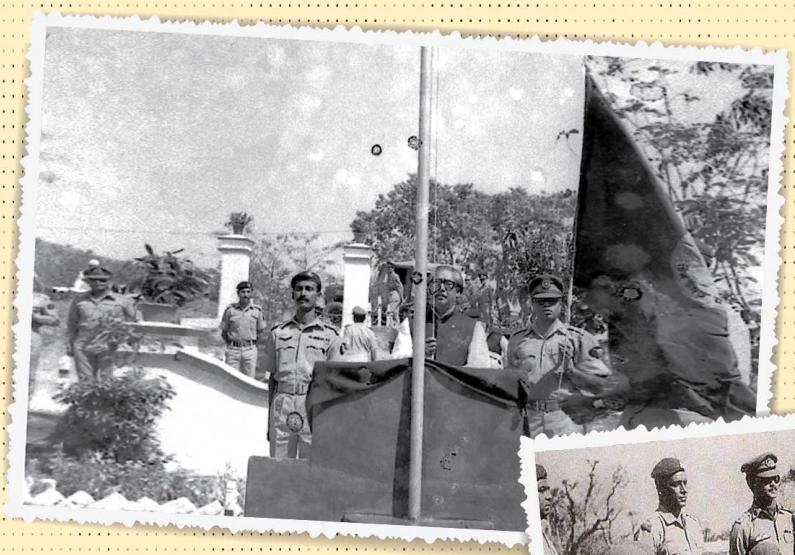

১৯৭৪ সালে রংপুর সেনানিবাসে পতাকা উত্তোলন করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালে ঢাকা সেনানিবাসে সেনাসদস্যদের সঙ্গে জাতির পিতা

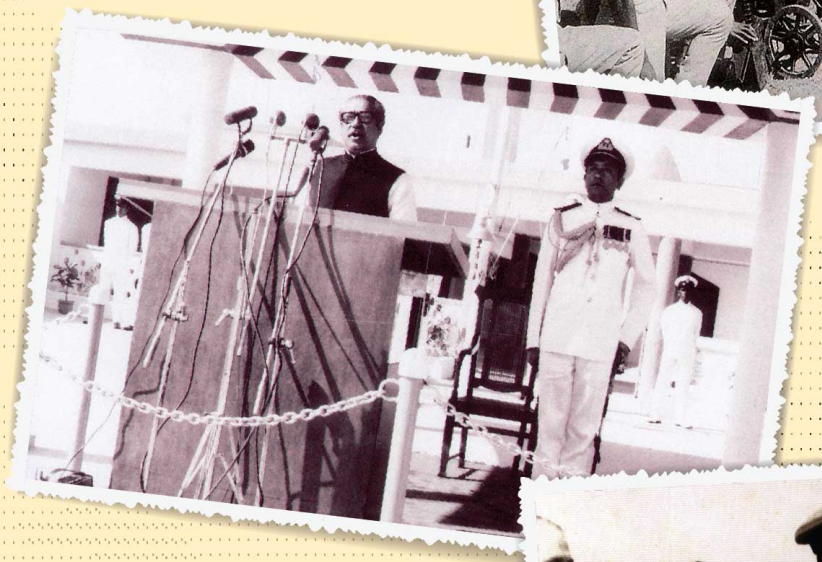

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতির পিতা বানৌজা ঈসা খান-এর কমিশনিং অনুষ্ঠান শেষে সর্বস্তরের নৌসদস্যের উদ্দেশে ভাষণ দেন

বিমান বাহিনী ঘাঁটি ঢাকায় জাতির পিতাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খাদেমুল বাশার

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট ও খাম অবমুক্ত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৭ জুন ১৯৯৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রয়াত প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের দায়িত্বভার হস্তান্তর

বিমান বাহিনীর শীতকালীন গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড ১৯৯৯ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ

সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বগুড়া এরিয়ার শীতকালীন প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

৫৫ পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত শীতকালীন প্রশিক্ষণের অ্যাসল্ট রিভার ক্রসিং মহড়া পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, এনডিসি, পিএসসি গত ২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ৯ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন বোমকা সামরিক প্রশিক্ষণ এলাকা পরিদর্শন করেন

প্রশিক্ষণ এলাকা পরিদর্শন করছেন জিওসি ১০ পদাতিক ডিভিশন

সদর দপ্তর ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের অধীন ৫ আর ই ব্যাটালিয়নের সেনাসদস্য কর্তৃক গত ৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ফরমেশন পর্যায়ে মহড়া অ্যাসল্ট চর ল্যান্ডিং অনুষ্ঠিত হয়

৯ পদাতিক ডিভিশনের অধীন ৪০ ই বেঙ্গল (মেকানাইজড) কর্তৃক স্বর্ণদ্বীপ-এ পরিচালিত ম্যানুভার অনুশীলনে অগ্রাভিযানের (অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট) দৃশ্য

গত ১০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্পেশাল ফোর্স ১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সঙ্গে ইউএস স্পেশাল ফোর্সের যৌথ প্রশিক্ষণ টাইগার সার্ক-১৯-এর একটি দৃশ্য

জাহাইজ্জার চর-এ ম্যানুভার এক্সারসাইজের একটি দৃশ্য

নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমুদ্র মহড়া ‘এক্সারসাইজ সি থান্ডার-২০১৫’-এ মিসাইল ফায়ারিং অবলোকন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত নৌবাহিনীর বিশেষ সমুদ্র মহড়ার স্টিম পাস্টে অভিবাদন গ্রহণ করছেন নৌবাহিনী প্রধান

সোয়াড্স কমান্ড অধীন নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণের একটি দৃশ্য

বার্ষিক সমুদ্র মহড়া ‘এক্সারসাইজ সি থান্ডার-২০১৫’-এ অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীর রণতরী এবং মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট

বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কমান্ড সেফটি সপ্তাহ - ১/২০১৫ উপলক্ষে অনুশীলনরত বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ

যৌথ সামরিক মহড়া Exercise Cope South-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক অনুশীলন 'উইনটেক্স-২০১৫' উপলক্ষে সশস্ত্র টহলের দৃশ্য

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক অনুশীলন 'উইনটেক্স-২০১৫'-এ বিমান বাহিনীর সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের দৃশ্য

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে যৌথ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং United States Army Pacific Command (USARPAC) এর যৌথ উদ্যোগে Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)-২০১৫-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলাম, বিজিবিএস, এডব্লিউসি, পিএসসি

Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)-২০১৫-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যদের স্টাফ প্ল্যানিং-এর দলগত আলোচনা

দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী

রুমা সেতুর শুভ উদ্বোধন করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৯ পদাতিক ডিভিশনের ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের
অধীন ২০ ইসিবির সেনাসদস্য কর্তৃক
আপৎকালীন নদীভাঙন প্রতিরোধ কার্যক্রম
তদারকির একটি দৃশ্য

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোড নির্মাণ

বান্দরবানে ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ
থানচি-আলীকদম সড়ক নির্মাণ

জাটকা সংরক্ষণ অভিযান-২০১৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষার লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ-২০১৫ উপলক্ষে
বৃক্ষরোপণ করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

জরুরি ত্রাণসামগ্রী পরিবহনে বাংলাদেশ বিমান
বাহিনীর একটি AN-32 পরিবহন বিমান

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের একটি দৃশ্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্তব্যরত সেনাসদস্যগণ কর্তৃক অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি দৃশ্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এপিসিতে টহলরত সেনাসদস্যগণ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এপিসিতে টহলরত সেনাসদস্যগণ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী

UNIFIL-এর Maritime Task Force-এর অধীনে লেবানন উপকূলে টহলরত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ আলী হায়দার

MALI-তে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন BANFRU-2, MINUSMA-এ টহলরত নৌসদস্যবৃন্দ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে একজন গুরুতর আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে টহলরত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি Mi-17 হেলিকপ্টার

সশস্ত্র বাহিনীর সেবামূলক কার্যক্রম

নেপালে ভূমিকম্পে দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থে সশস্ত্র বাহিনী

দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বাসস্থান নির্মাণ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

রামু বৌদ্ধবিহার পুনর্নির্মাণ

ঢাকার মিরপুর-১৪ নাবিক কলোনি মাঠে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবারকল্যাণ সংঘ, ঢাকা শাখার উদ্যোগে গরিব ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

মালদ্বীপে বিশুদ্ধ পানির সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল আহমেদ নাজিমের (অব.) কাছে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি ও ডি-স্যালাইনেশন প্ল্যান্ট হস্তান্তর করেন বানৌজা সমুদ্রজয়-এর অধিনায়ক

নেপালে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিমান বাহিনীর সি-১৩০ পরিবহন বিমানে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর প্রাক্কালে সংবাদ সম্মেলনে ব্রিফ করছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের উদ্যোগে ঘাঁটিসংলগ্ন অসামরিক লোকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে

সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান/সফর

সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০১৫-এ ৯ পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত আর্টিলারি স্টল পরিদর্শন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৪-এর সকালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৪-এ সেনাকুঞ্জে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সেনাকুঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে সশস্ত্র বাহিনীর ইফতার-২০১৫-এ মোনাজাতরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধানগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত War Veteran কর্মকর্তাগণ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শন করেন

গত ২৪ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ভারতীয় এনডিসি টিম সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শন করেন

গত ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সেনাবাহিনী প্রধান এবং সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০১৫-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্টলের পরিবেশনা উপভোগ করছেন

জেনারেলস্ কনফারেন্স-২০১৫-তে যোগদানকারী কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে এএমসি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলের নারী রিক্রুটদের সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সদর দপ্তর ১০ পদাতিক ডিভিশনের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ডিএসএসসি মিরপুর সেনানিবাসে 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মিরপুর ডিওএইচএস-এ শহীদ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত International Day of United Nations Peacekeepers-2015 অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান লে. জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হককে সেনাবাহিনী প্রধানের র‍্যাংক ব্যাজ (জেনারেল) পরিয়ে দেন

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরকালে ৯ পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সেনাবাহিনী প্রধান

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নৌপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৪ অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধানকে নৌবাহিনী পদক পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বানৌজা কে জে আলী, সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার কমিশনিং এবং এলসিটি-১০৩ ও ১০৫-এর নৌবাহিনীতে সংযোজন অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০১৪-বি এবং মিডশিপম্যান ২০১৩-এ ব্যাচের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে সেরা চৌকস মিডশিপম্যানকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ সফরকালে নৌসদরে ভারতীয় নৌপ্রধানকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন নৌবাহিনী প্রধান

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ২১তম আন্তর্জাতিক সি পাওয়ার সিম্পোজিয়ামে অন্যান্য দেশের নৌবাহিনী প্রধানগণের সঙ্গে বাংলাদেশের নৌবাহিনী প্রধান

দায়িত্বভার গ্রহণের পর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনীতে এল-৪১০ পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধানকে র‍্যাংকব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন সেনা ও নৌবাহিনী প্রধানগণ

বিমান সদর পরিদর্শনকালে বিমান সদর প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ শেষে মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনীর ২১৪ এমআরও ইউনিট পরিদর্শনকালে প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিকে ব্রিফ করছেন বিমান বাহিনীর একজন কর্মকর্তা

সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্-এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাচার্য মেজর জেনারেল শেখ মামুন খালেদ, এসইউপি, পিএসসি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্-এর উপাচার্য

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি-২০১৪-এ এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যগণকে সনদ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্যাপস্টোন কোর্স-২০১৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে গ্রুপ ছবিতে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের সঙ্গে কমান্ড্যান্ট, এনডিসি ও কোর্স ফেলো মেম্বারগণ

ডিএসসিএসসি ২০১৪-১৫-এর শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করছেন

ডিএসসিএসসি কোর্সের ইনডোর এক্সারসাইজ

গত ১২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এমআইএসটিতে নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম, পিএইচডি উপস্থিত ছিলেন

গত ১২ মে ২০১৫ তারিখে শ্রীলংকা আর্মি ডকট্রিন কমান্ডের Maj Gen A M Perera, RWP, RSP, psc-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল এমআইএসটি পরিদর্শন করেন

গত ১ থেকে ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 1st International Conference of Military Medical School-2015 (ICMMS)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট এএফএমসির কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মোঃ জাহাংগীর হোসেন মল্লিক

Commanding General, Pacific Regional Medical Command কর্তৃক আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করছেন কমান্ড্যান্ট, এএফএমসি ও অন্যান্য কর্মকর্তা

গত ১০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে Maj Gen Mounir Ayed Al Zoubi, Commander of Presidential Guard of Palestine কর্তৃক বিপসট পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ের একটি দৃশ্য

গত ২৪ থেকে ২৮ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিপসট কর্তৃক পরিচালিত 'বেসিক ফাস্ট রেসপন্ডার ফর ডিজাস্টার রিলিফ কোর্স'-এর বহিরাঙ্গন অনুশীলন মহড়ার একটি দৃশ্য

সশস্ত্র বাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান

সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ঈদ পুনর্মিলনীতে কর্মকর্তা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন

গত ৯ অক্টোবর-২০১৫ তারিখে ঈদ পুনর্মিলনীতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জেসিওস ও অন্যান্য পদবির সৈনিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের সন্তানদের খেলার একটি দৃশ্য

সেনাবাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান

বিদায়ী সভানেত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে বর্তমান ও বিদায়ী সভানেত্রী

প্রয়াসের শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে বর্তমান ও বিদায়ী পৃষ্ঠপোষক

বর্তমান সভানেত্রীকে শুভেচ্ছা প্রদান করছেন লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

চিলড্রেনস ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে বর্তমান ও বিদায়ী সভানেত্রী

সেনা পরিবারকল্যাণ সমিতি, যশোর অঞ্চলের প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সেনাবাহিনী প্রধানের পত্নী

শ্রীলংকার সেনাবাহিনী প্রধানের পত্নী কর্তৃক ঢাকা সেনাপরিবার কল্যাণ সমিতি পরিদর্শন

সেনা পরিবারকল্যাণ সমিতি ঢাকা অঞ্চলের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বর্তমান পৃষ্ঠপোষক

নৌবাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান

চট্টগ্রামে নাবিক কলোনি-১-এ নৌ পরিবার শিশু নিকেতন-১-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

বাংলা নববর্ষ-১৪২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে নৌসদরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবারকল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় নৌপ্রধানের পত্নী প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

চট্টগ্রাম বিএন আশার আলো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি পরিদর্শন করছেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

বিমান বাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান

কেন্দ্রীয় বাফওয়ার মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করছেন বাফওয়া সভানেত্রী তাসনীম এসরার

বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৫ উদ্বোধন করছেন বাফওয়া সভানেত্রী

লেডিস ক্লাব তেজগাঁওয়ে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাফওয়া সভানেত্রী

বাংলা নববর্ষ-১৪২২ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখী মেলায় সংগীত পরিবেশন করছে খুদে শিল্পীরা

সশস্ত্র বাহিনীর ক্রীড়া কার্যক্রম

আন্তঃবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৪-এ চ্যাম্পিয়ন দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ট্রফি প্রদান করেছেন প্রধান অতিথি কমডোর কমান্ডিং খুলনা কমডোর এম শাহীন ইকবাল, (ট্যাজ), এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন

এএসপিটিএসের সৈনিক কর্তৃক ফায়ার ডাইভের মহড়া

আন্তঃবাহিনী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৪-এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বনাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার দৃশ্য

দ্বিতীয় আরচ্যারি ক্লাব কাপ-২০১৫ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী আরচ্যারি দলের সদস্যবৃন্দ

নৌবাহিনী আন্তঃজাহাজ/ঘাঁটি সাঁতার এবং ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা-২০১৫-এ অংশগ্রহণকারী দলের মাঝে প্রধান অতিথি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল

খুলনায় বানৌজা তিতুমীরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৫-এর চ্যাম্পিয়ন বানৌজা তিতুমীর দলের খেলোয়াড়দের ট্রফি প্রদান করেন প্রধান অতিথি কমডোর কমান্ডিং খুলনা

আন্তঃশাহীন হকি প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর চ্যাম্পিয়ন বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা দলকে পুরস্কৃত করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদকে ট্রফি প্রদান করছেন বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুর ভারপ্রাপ্ত এয়ার অধিনায়ক

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত
স্কুল/কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

রচনা প্রতিযোগিতা-২০১৫

সেনাবাহিনী

ক গ্রুপ - একাদশ হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

আনজুম-উল-হুসনা কেমি (১ম স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর

মোসা. মরিয়ম নেসা (২য় স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

সুমাইয়া আক্তার মুক্তা (৩য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা

জান্নাত আরা শিউলী (৪র্থ স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

খ গ্রুপ - ৯ম হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত

ফাতেমা তুজ জোহরা (১ম স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

উম্মে তহমিনা জেরীফ মিশু (২য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় মোমেনশাহী

মরিয়ম আক্তার (৩য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় রাজেন্দ্রপুর

নাবিলা রায়হানা (৪র্থ স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

গ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

আফিফ হিশাম (১ম স্থান)
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

মো. আবু তালহা (২য় স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

মো. হাসান মোর্শেদ (৩য় স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জান্নাতুল ফেরদাউস ইসরাত (৪র্থ স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় যশোর

নৌবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

শাহরিহীন সানম নিন্‌তী (১ম স্থান)
নেভি এ্যাংকরেজ, খুলনা

জিলান মোহাম্মদ নূর (২য় স্থান)
বিএন স্কুল এণ্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

নাজীবা নাসীবা যায়ীমা (৩য় স্থান)
বিএন স্কুল, কাপ্তাই

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

মাহমুদা সিগমা (১ম স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

মেহের আফরোজ (২য় স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

মাইশা তাসনীম অরণী (৩য় স্থান)
বিএন স্কুল এণ্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

বিমান বাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

হুমায়রা তাসনিম সুবর্ণা (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

মালিহা আফরোজ মৌরি (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

নাসিহা জাহান মুনা (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

মাহমুদা ইসলাম (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

শাকরুনা তাহমীদ তূবা (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

নুসরাত জাহান মুক্তা (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

আমাদের সন্তানদের লেখনীতে উঠে এসেছে স্বাধীনতার অঙ্গীকার এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাহাত্ম্য

"পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতা শুধু শব্দমাত্র নয়, এটি এমন এক অধিকার ও অনুভব যা মানুষের জন্মগত। আর

মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী : দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গড়ে ওঠে নিয়মিত বাহিনী ও অনিয়মিত বাহিনী। এদের মধ্যে নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সশস্ত্র বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্ত সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য।

সঠিক দিকনির্দেশনা, নিরলস পরিশ্রম এবং সকল সদস্যের আনুগত্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপক্ক পরিস্ফুটন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশমাতৃকার কল্যাণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে তারা পালন করছে এবং দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতির ঐক্য ও আস্থার প্রতীক

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা:

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের অহংকার। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে জাতীয় জীবনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্যোগকালীন সময়ে বিপন্ন মানুষের প্রয়োজন নিবেদিত নিয়োজিত থাকাসহ সশস্ত্র বাহিনী দেশের কল্যাণে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে,

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৫

সেনাবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সাদিয়া সুলতানা আরিফা (১ম স্থান)
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

আকীদ আহমদ আনসারী (২য় স্থান)
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ

উম্মে তাহমিনা জেরীফ মিশু (৩য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় মোমেনশাহী

ইসরাত জাহান রিপা (৪র্থ স্থান)
ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

সৈয়দা জাবিন তানজিম (১ম স্থান)
রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জান্নাতুল ফেরদাউস ইসরাত (২য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় যশোর

ইশরাত জেরীন বনী (৩য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গাজীপুর

লুৎফুন নেছা মীম (৪র্থ স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গাজীপুর

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৫

(গ গ্রুপ - ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)

রাফিয়া ফাইজা (১ম স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাহিন হাসান স্নেহা (২য় স্থান)
রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

উম্মে সুমাইয়া নুসরাত (মাবিয়া) (৩য় স্থান)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ

আলিমাহ মেহজাবিন (৪র্থ স্থান)
ময়নামতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কুমিল্লা

নৌবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

রাইসা করির (ঐশী) (১ম স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

খাদিজাতুল কোবরা (২য় স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

মরিয়ম বেগম জেসী (৩য় স্থান)
বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

তাসনিয়া ফেরদৌসী (১ম স্থান)
নেভি এ্যাংকরেজ, ঢাকা

সায়মা সুরাইয়া সাদিয়া (২য় স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

সামিহা চৌধুরী নওশিন (৩য় স্থান)
বিএন স্কুল, কাপ্তাই

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৫

বিমান বাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

সৌরভ রায় (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর

মাহির মহতাসিম তাহমিদ (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

মোছা. মাবিয়া আফরিন রিমি (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

মেহেজাবিন নুসরাত (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

লতা পোদ্দার (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

মোরতাফিয়া ইসলাম রুপন্তি (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর আওতাধীন বিশেষ শিশুদের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা ও নৌবাহিনীর পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

সেনাবাহিনী

মো. আসিফ আলমগীর (১ম স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস

মো. আব্দুল্লা আল নোমান (২য় স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস

রিফাত উল ইসলাম (৩য় স্থান)
প্রয়াস, সাভার সেনানিবাস

মোছা. সামিরা আজাদ অজন্তা (১ম স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস

মো. হাবিবুর রহমান (ছনি) (২য় স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস

মো. আতিকুর রহমান (আতিক) (৩য় স্থান)
প্রয়াস, চট্টগ্রাম সেনানিবাস

নৌবাহিনী

ফাত্তাউল আসফি (১ম স্থান)

ফাহিমা সরোয়ার ইফা (২য় স্থান)

সব্যসাচী বড়ুয়া নিলয় (৩য় স্থান)

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৫

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে ভালোবাসার দেশকে ও সশস্ত্র বাহিনীকে

Published by
Armed Forces Division

Graphic Design & Printing by
Conference & Exhibition
Management Services Ltd. (CEMS)

শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়
বাংলাদেশ
বিমান বাহিনী
বাংলার আকাশ রক্ষিব মুক্ত